Nanar Hati—Bengali translation by Nilina Abraham of Muhammed Basheer's Malayalam novel, *Enruppappekkoranentarnu*. Sahitya Akademi, New Delhi, Price Rs. 2·00 (1960).

সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে
ত্রিবেণী প্রকাশন কর্তৃক
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত

মুদ্রাকর : দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস,
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ,
২৮, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : সমীর সরকার
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস
বাঁধাই : শ্রীকৃষ্ণ বুক বাইণ্ডিং

দাম : দুই টাকা

কয়েকটি কথা

বহু ভাষার দেশ ভারতবর্ষ। বহু ভাষা, বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পরিচ্ছদ, বহু আচার। আহার্যের মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য আছে। তবু একটি নিবিড় ঐক্য আছে; এই ঐক্য হেতুই ভারতের সমাজে রাষ্ট্রে মানুষের মনে বিবর্তনমূলক, বিপ্লবমূলক, যে আলোড়ন চলে তাও যেন কোন একটি অজ্ঞাত কেন্দ্রস্থল থেকেই উৎসারিত, যার ফলে সেই আলোড়নের যে আঘাত, ও আঘাত হেতু উত্থিত ধ্বনি পূর্ব প্রান্তে ওঠে পশ্চিম প্রান্তেও ঠিক সেই আঘাত সেই ধ্বনিই উঠে থাকে। ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সাহিত্যে যে জীবন এবং জীবনের যে পরিবর্তন তা পূর্ব প্রান্তের পাঠকের কাছে একেবারে মনে হয় এ কথা তাদেরই কথা; কিছু দুর্বোধ্য নয়, কিছুই সঙ্গতিহীন নয়। দক্ষিণের ভারতীয় সঙ্গীত দক্ষিণের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও উত্তরের বা পূর্বের বা পশ্চিমের যাত্রীর কাছে সহজ ও সুসঙ্গত, যার জন্য উত্তরের তবলা বা মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজ বাজিয়ে অনায়াসে সঙ্গত করে যেতে পারেন।

এই অতি বিদিত সত্যও এক এক সময় অতি উজ্জ্বল অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিচিত্র ঘটনায় বা এমনই ধরনের শিল্পসঙ্গীতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ে। সম্প্রতি সাহিত্য আকাদেমি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি অপর ভাষাগুলিতে অনুবাদ করে আমাদের মনোরাজ্যের দুস্তর নদনদীগুলির উপর সেতু বন্ধন করছেন; তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ; ওই সেতুপথে মালয়ালম ভাষার সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভৈকম মহম্মদ বশীরের একখানি উপন্যাসের অনুবাদ আমার কাছে তাঁরা পাঠিয়েছিলেন। মালয়ালমে যে নাম ছিল তারই অনুবাদ করে নাম হয়েছে—'নানার হাতি'। এক প্রাচীন মুসলমান পরিবারের একটি কুমারী কন্যা এর নায়িকা—তার নানার হাতি ছিল। হাতির দাঁতের খড়ম ছিল। বাড়িতে প্রাচীন বিশ্বাসের তাঁবুর কানাত বা উঁচু পাঁচিল ছিল, নায়িকাকে আবৃত করে বোরখা ছিল। এবং নানান বাধা নিষেধ ছিল। অত্যন্ত সহজ প্রকাশে প্রকাশ করেছেন। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমাদের গ্রামের মুসলমান খাঁ সাহেবদের বাড়ির বিবরণ পড়ছি। মনে হয়েছে ভেঙেপড়া গ্রাম্য জমিদারদের বাড়ির বিবরণ পড়ছি। অর্থাৎ যা ঘটেছে, বা ঘটছে ভারতের পূর্বপ্রান্তে, তাই ঘটছে পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণ প্রান্তে। এবং দুই-স্থানের সাহিত্যিক এক ভাবনায় অনুপ্রাণিত। গ্রন্থখানির মধ্যে যে সত্য

প্রকাশিত হয়েছে তা বর্তমানের বাস্তব সত্য এবং সমাজ সত্য। ব্যক্তিগত অর্থ-নৈতিক কাঠামো ভাঙার সঙ্গে ঘর ভাঙছে, ঘরের সঙ্গে সমাজ ভাঙছে, প্রাচীন বিশ্বাস পাল্টাচ্ছে—নতুন যুগ আসছে—তার সঙ্গে প্রাচীন জগৎ নবীন জগতে পরিবর্তিত হয়ে দিবারাত্রির ছন্দে কক্ষপথে চলেছে।

গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছেন একজন বাঙালী কন্যা, মালয়ালমভাষী অঞ্চলের বধূ—আগে ছিলেন নীলিমা বিশ্বাস—এখন নীলিমা আব্রাহাম। অতি চমৎকার অনুবাদ করেছেন, ঘরোয়া কাহিনী তিনি ঘরোয়া বাংলায় প্রকাশ করেছেন। বাংলার উপন্যাস গল্প ভারতবর্ষে আজও অগ্রগণ্য। সেই অগ্রগণ্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই মালয়ালমের প্রবীণ লেখকের গ্রন্থ 'নানার হাতি' উপাদেয় এবং মূল্যবান বলেই গণ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

টালা পার্ক
কলিকাতা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

আধুনিক মালয়ালম উপন্যাস-সাহিত্য উপরতলার লোকেদের জীবন বর্ণনা থেকে ক্রমশ সরে দাঁড়াচ্ছে। আধুনিক মালয়ালম লেখকগণ অনুভব করছেন যে, উপন্যাস সাধারণ লোকের জীবনের অন্তরতম প্রদেশে অনুসন্ধান করে যা সত্য এবং বাস্তব তাকে চিত্রায়িত করবে। আজকের লেখকেরা যে সাধারণ লোকের জীবন নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেছেন তার কারণই হচ্ছে যে, আজ সাধারণ জনগণের মধ্যে এক চেতনা, এক জাগৃতি এসেছে। আমাদের লেখকদের অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং তাই সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার তাগিদ ও চাহিদার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি আছে। আধুনিক মালয়ালম লেখকদের মধ্যে যাঁরা আজ সাহিত্যের সর্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন, ভৈকম মুহম্মদ বশীর তাঁদের মধ্যে একজন।

আধুনিক উপন্যাস লেখকদের মধ্যে আমরা প্রধানত দুই শ্রেণীর লেখক দেখতে পাই। তাঁদের বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ এই দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত বশীর শেষের দলে পড়েন। বহির্জগতের একটি প্রতিচ্ছবি তিনি মনের মধ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে ইনি ডি. এইচ. লরেন্সের দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

'এণ্টুপ্পুপ্পা কেকা রো আনেনডারুন্নু' (প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে) মালয়ালম ভাষার একটী বিশিষ্ট রচনা। এতে একটি মুসলমান পরিবারের শেষ বংশধরের অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, পরিবারটি কেমন করে প্রাচুর্য থেকে দৈন্যের মধ্যে নেমে গেল। শ্রীযুক্ত বশীরের রচনা-নৈপুণ্যে এই-কাহিনীর মধ্যে একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবন নিখুঁত ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত বশীর এই বইটিতে ঘরোয়া ভাষা ব্যবহার করে সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এবং ভাবী লেখকদের জন্য এক নূতন ধরনের সাহিত্য স্থষ্টির পথ-নির্দেশ দিয়েছেন।

যোসেফ মুণ্ডসেরি

নানার হাতি

ছোটবেলার কথা যখন মনে পড়ে তখন মনে হয় তা যেন কত হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। সেই ছোটবেলা থেকে আজ অবধি অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। সে সব ঘটনা কুঞ্ঞুপাতুম্মার কাছে কৌতুকের মত মনে হয়। হ্যাঁ—কৌতুক ভাবাই ভালো—কারণ কাঁদার চেয়ে হাসাই ভালো। তাই সেই সব ঘটনার কথা মনে পড়লে ওর বেশ মজাই লাগে।

কাউকে যে কখনও সে কোনও কষ্ট দিয়েছে তা কুঞ্ঞুপাতুম্মার মনে পড়ে না—কাউকে না, এমন কি একটা পিঁপড়েকেও না। আল্লা-রসুলের কোন সৃষ্টির প্রতিই ওর রাগ বা ঘৃণা ছিল না। খুব ছোটবেলা থেকেই সমস্ত জীবজন্তু প্রাণী পতঙ্গের ওপর ওর অসীম স্নেহ। তার জীবনে সবচেয়ে সে ভালবেসেছিল একটি হাতিকে। হাতিটাকে কিন্তু একবারও চোখে দেখে নি। না দেখলেও তাকে ভালবাসতে তার আটকায় নি।

ওর বয়স যখন মাত্র সাত আট বছর তখন এই হাতির কথা ও শুনেছিল। ওর আম্মা তখন ওর ওপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। নিষেধাজ্ঞা ছিল এই যে, কুঞ্ঞুপাতুম্মা পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। শুধু মেলামেশাই নয়, কোন সম্বন্ধই রাখতে পারবে না। মুসলমানের ছেলেমেয়ে হলেও নয়। কেন? কী ব্যাপার? ওর আম্মা তখন ওকে সেই বিখ্যাত গোপন কথাটি বললেন।—

'আমার সোনা মেয়ে। তুই কি যে-সে ঘরের মেয়ে রে। তুই যে আনামকারের (নাম) লক্ষ্মী মেয়ের লক্ষ্মী মেয়ে। তোর নানার যে একটা হাতি ছিল। এই এত বড় দাঁতওলা হাতি!'

সেই আম্মার কাছ থেকে হাতিটির কথা শোনামাত্রই কুঞ্ঞুপাতুম্মা হাতিটাকে গভীর ভালবেসে ফেলল, মনে মনে কতবার যে ও 'আমার মিষ্টি হাতি' 'সোনা হাতি' বলে আওড়াল তার ঠিক নেই। কল্পনায় সেই হাতির সঙ্গে খেলা করে ও বড় হতে লাগল। হাতে পায়ে কানে কোমরে সব সোনার গয়না পরে, সুন্দর সিল্কের মুণ্ডু,[১] সিল্কের ব্লাউজ আর মাথায়

(১) মুণ্ডু—মালয়ালীদের পোশাক, অনেকটা লুঙ্গীর মত।

জরির তাট্টা[২] পরে ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে ও সেই হাতির সঙ্গে খেলা করত।

কুঞ্ঞুপাতুম্মা ছিল ফরসা। শুধু একটি কালো বিন্দুর প্রক্ষেপ ছিল তার মধ্যে, সাদা কাপড়ে একটি কালো কালির দাগের মত—তা হচ্ছে ওর গালের একটা ছোট্ট কালো তিল। এ নিয়ে কেউ কিছু না বললেও ওর মনে খুব দুঃখ ছিল এই কালো তিলটার জন্য। ওর যখন চোদ্দ বছর বয়স, তখন মাত্র ও জানতে পারল যে ওই তিলটা ওর সৌভাগ্য-তিল। সে সময় ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কে ওকে বিয়ে করবে সে সম্বন্ধে ওর কোন ঔৎসুক্য ছিল না। ওর তখন শুধু এই ভেবে আনন্দ হচ্ছিল যে বিয়ে হলে ও পান খেতে পাবে। মুসলমান ঘরে কুমারীদের পান খেতে নেই। আল্লাহ্ বা নবীর এ সম্বন্ধে কোন অনুশাসন আছে কিনা তা ওর জানা ছিল না, তবে ওদের সমাজের নিয়মানুসারে কুমারী মেয়েরা পান খেতে পায় না। তারা অচেনা পুরুষের সামনে বেরও হয় না। কুঞ্ঞুপাতুম্মা অবশ্য যখন খুব ছোট ছিল তখন বাইরের লোকের সামনে বেরিয়েছে। তবে বিশেষ কারুর সামনে বেরিয়েছে বা কথা বলেছে বলে ওর মনে পড়ে না। বিশেষ ভাবে যদি ওর কারুর কথা মনে পড়ে তা মেয়েদেরই কথা।

যে সব মেয়েদের কথা ওর মনে পড়ে তারা অন্য ধর্মের। ওদেব সমাজে তাদের সব কাফের বলে। কুঞ্ঞুপাতুম্মা শুধু এইটুকুই জানে যে পৃথিবীতে মাত্র দুটো জাত আছে। মুসলমান আর কাফের। মৃত্যুর পর কাফেরেরা তো—সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, নরকে যাবে। কারণ খুব সোজা, ওরা সবাই ভুল পথে চলেছে। আর যদি মুসলমানরা কাফেরদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে তাহলে তারা ঘোরতর পাপী ছাড়া আর কিছু নয়। যে-সব কাফের কুঞ্ঞুপাতুম্মা দেখেছে তারা সব স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। বাপজান যখন ওকে খুব সাজিয়ে গুজিয়ে নদীতে নিয়ে গেছেন স্নান করার জন্য তখন এইসব শিক্ষিয়িত্রীদের ও দেখেছে। শহর থেকে অনেক সময় বড় লোকের মেয়েরাও নদীতে স্নান করতে আসত, তাদেরও ও দেখেছে। এরা সব কেউই কুঞ্ঞুপাতুম্মার মত অত গয়না পরে আসত না। কেউ কেউ ওর দিকে বেশ ঈর্ষার সঙ্গে তাকাত—সেটা ও লক্ষ্য করত। কেউ কেউ আবার যখন ওকে দেখিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করত—'ওই ছোট্ট মেয়েটা কে রে'—সেটাও ওর কান এড়ায় নি। তখন আর একজন বেশ ভক্তি আর সম্মানের ভাব দেখিয়ে বলেছে—'ওই মেয়েটা—ও ভট্টনটীমা (নাম)

(২) তাট্টা—মুসলমান মেয়েদের অবগুণ্ঠন।

কাকার মেয়ে, ওর নাম কুঞ্জুপাতুম্মা। ও কে জানিস? ও আনামক্কারের নাতনী।'

আবার কেউ কেউ বলেছে—'আমাদের কুঞ্জুতাচুম্মা দিদির মেয়ে না?'

'দেখি, দেখি কুঞ্জুপাতুম্মা কেমন করে হাসে দেখি' বলে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা ওর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াতেন। তাঁদের খুব ভালো লাগত কুঞ্জুপাতুম্মার। ওরা কাফের হলেও ওদের গায়ে কি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। ওঁরা পরতেন শাড়ি আর গায়ে চমৎকার ব্লাউজ আর ব্লাউজের নীচে আঁটসাঁট সুন্দর কাঁচুলি। মাথায় ফুল গোঁজা। কেউ কেউ তাঁর মাথার ফুল নিয়ে কুঞ্জুপাতুম্মার চুলে গুঁজে দিতেন। কেউ কেউ আবার ওর গালের তিলটাকে টুক করে তুলে নেবেন এমন ভাব দেখাতেন। ওঁদেব এই সব হাসি-তামাশায় কুঞ্জুপাতুম্মা খুব স্বস্তি পেত না, তবু ওব ইচ্ছে হতো যে ওঁদের মত সেও শাড়ি ব্লাউজ আর আঁটসাঁট কাঁচুলি পরে। ওর এই ইচ্ছের কথা ও বাপজানের কাছে বলেও ফেলেছিল একদিন -তাতে ওই সব শিক্ষয়িত্রীরা হেসে খুন। ওঁদের মধ্যে অবশ্য একজন বলেছিলেন, 'কুঞ্জুপাতুম্মা তুমি আগে বড় হও, তার পরে তো'। বড হতে হবে। সেইদিন থেকে সব সময় ওর মনে এই ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে দাঁড়াল—বড হতে হবে। কবে সে বড হবে?

একদিন ও আম্মাকে জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁ আম্মা আমি কবে বড় হব?'

আম্মা কি ব্যাপার জানতে চাইলে ও সব কথা বলে ফেলল। ওর আম্মা তখন ওকে ভয় দেখিয়ে বললেন:

'কুঞ্জুপাতুম্মা, কাফেরদের ধরনে কাপড়চোপড় পরা আমাদের চলবে না। আমাদের সব সময় কাফেরদের উল্টোটাই করতে হবে।'

বাপজানও বললেন—'তোমার আম্মা ঠিকই বলেছেন সোনা। আমাদের এসব করা চলবে না।'

না চললে আর কী করা যাবে। বাপজানের কথার ওপর কথা নেই। তিনি ঠিকই বলেছেন। ইসলামের রীতিনীতি অনুযায়ী চলতেই হবে। ওর বাপজানকে গ্রামের লোক কত সম্মান, কত আদর করে। বাপজান মসজিদেরও একজন কর্তাব্যক্তি। আর গ্রামের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তি। বাপজান সব সময় মাথা কামিয়ে চকচকে করে রেখেছেন। তাঁর পদমর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে তিনি তাঁর গোঁফ দাড়িও রেখেছেন। বড় গোঁফের দুই প্রান্ত পাকিয়ে মুচড়ে দুপাশে দুটো শিঙের মত তুলে দিয়েছেন। বাপজান শুধু মুণ্ডু ব্যবহার করেন আর সব সময় কাঁধের ওপর লম্বা একটা জরির চাদর ফেলে রাখেন। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এই চাদরের প্রান্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়লে

বাপজানের সঙ্গে যে সব লোক যায় তাদের কেউ চাদরের প্রান্ত বেশ সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরে। বাপজান হয়তো তা জানতেও পারেন না। বাপজান তাঁর ঋজু দীর্ঘ দেহ নিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলেন। বাপজান কিন্তু একবারও মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন না। শুধু রমজানের মাসটা তিনি উপোস করেন আর তখন গরিবদুঃখীদের দান করেন। বাপজানের হজে যাওয়ারও ইচ্ছে আছে, তবে সে কুঞ্জুপাতুম্মার বিয়ের পর।

এদিকে কুঞ্জুপাতুম্মার বিয়ের কথা আরও বেশী করে চলতে লাগল। বাড়িতে তখন যেন রোজ উৎসব লেগে আছে। রোজ পাঁচ ছয় গোছা পান খরচ হয়।

বাপজান খুব পান খান না। পান খান আম্মা। আম্মার রোজ শ'খানেক নরম ছাঁচি পান চাই। পান চিবোতে চিবোতে গল্প করা ছিল আম্মার কাজ। আম্মা তার সব গয়না পরে, সিল্কের মুন্টু, সিল্কের ব্লাউজ পরে, জরির তাট্টা দিয়ে মাথা ঢেকে পানের বাটা নিয়ে নরম মাদুরের ওপর বসতেন। কখনও খালি পায়ে চলাফেরা করতেন না। একজোড়া খড়ম পরে বেড়াতেন। খড়মের বুটি দুটো নানার হাতির দাঁতের তৈরী। সব সময় ওই খড়ম দুটো তাঁর কাছাকাছি থাকত।

পান খেতে আর আম্মার গল্প শুনতে পাড়ার অনেক মেয়েরা আসত। আম্মা বেশ রসিয়ে গল্প শুরু করতেন। গল্পের বিষয়-বস্তু কিন্তু বিশেষ কিছু নয়—হয় কুঞ্জুপাতুম্মার কথা নয়ত বাবার সাত বোনের কথা। বেশির ভাগ অবশ্য কুঞ্জুপাতুম্মার গালের ওই তিলটার কথাই হত।

আম্মা বলতেন, 'ওটি হচ্ছে আমার মেয়ের সৌভাগ্য-তিল। ওটা কি অমনিই ওখানে হয়েছে? নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে। হবে না? ও যে আনামকারের লক্ষ্মী মেয়ের লক্ষ্মী মেয়ে।' শুধু কি তাই। আম্মা আরও বলতেন—'পাঁচটা বাচ্চা পেটে ধরেছি কিন্তু একটাকেও রাখতে পারি নি। তারপর পীরের দরগায় শিরনি চড়িয়ে আল্লার দয়ায় এই একটি পেয়েছি।' তারপর কুঞ্জুপাতুম্মাকে কাছে টেনে ওর গায়ের গয়নাগুলোয় হাত বুলিয়ে অন্য মেয়েদের উদ্দেশ করে বলতেন, 'আচ্ছা তোমরাই বল, একে দেখেশুনে ভালো ঘরে পার করতে হবে না?' তারপর আর একটু রেগে গিয়ে বলতেন—'হ্যাঁ·········কুঞ্জুপাতুম্মার বাবার বোনেরা না এলেও ওর বিয়ে হবে। হবেই বা না কেন? ও যে আনামকারের লক্ষ্মী মেয়ের লক্ষ্মী মেয়ে।' তারপর কথা শেষ করে আশেপাশের মেয়েদের মধ্যে কাউকে উদ্দেশ করে বলতেন 'আচ্ছা মেয়ে, তুমি কি বল?'

মেয়েরা সব ঘাড় নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিত। এমনিভাবে আম্মার আর পাড়ার মেয়েদের গল্প শুনতে শুনতে ও একদিন একটা গুরুতর কথা শুনতে পেল। তা শুনতে পেয়ে ওর যেমন বিরক্তি আর রাগ ধরল তেমনি আক্ষেপও হল। ওর রাগের কারণ হচ্ছে যে ওদের পাড়ায়—শুধু ওদের পাড়ায় নয়, ওদের গ্রামের প্রায় সব ঘরেই চার পাঁচ বছর বয়সী সব ছেলে মেয়ে ছিল। একটা নতুন কেউ জন্ম নিচ্ছে তাতে অবশ্য ওর বলার কিছু ছিল না কিন্তু তাদের নামগুলো! তাদের নামগুলো শুনে অবধি ওর রাগের শেষ ছিল না। মাথায় মোট বওয়া মুটে, মাছধরা জেলে, ভিখিরী—শুধু তাই নয় প্রায় সব মুসলমান বাড়িতেই একজন করে কুঞ্জুপাতুম্মা আছে।

ও খোদা মালেক! এখন কি করা যায়? এতটুকু লজ্জা আর সম্মানবোধ থাকলে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের অন্য নাম দিতে পারত। কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মা তখনও একটা গোপন তথ্য জানতে পারে নি। গরিব লোকেরা সব কালেই ধনী আর বিখ্যাত লোকদের অর্থাৎ বড়লোকদের নাম নিয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের নাম রাখে। এটাই হচ্ছে সমাজের নিয়ম। ওরা ভাবে হয়তো এই নামের মাধ্যমেই তাদের কিছু ঐশ্বর্য, কিছু যশ লাভ হবে।

কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মার মনে হয় এটা ঠিক নয়। কেননা ওর ধারণা—পৃথিবীতে সে হচ্ছে একমাত্র কুঞ্জুপাতুম্মা, ওর বাপজান পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভট্টনটীমা, ওর আম্মা একমাত্র কুঞ্জুতাচুম্মা আর ওর নানা পৃথিবীতে একমাত্র আনামকার।

সত্যি একমাত্র তারা ছাড়া আরও কুঞ্জুপাতুম্মা আরও ভট্টনটীমা আরও কুঞ্জুতাচুম্মা আরও আনামকার সংসারে থাকবে এটা তার কিছুতেই বরদাস্ত হয় না। পাড়ার মেয়েদের সামনেই ও ওর এই মনের কথা আম্মাকে জানিয়ে ফেলল। শুধু তাই নয়, বেশ রাগ আর আক্রোশের সঙ্গে ও আম্মাকে জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা আমাদের নাম ওরা নেবে কেন?'

আম্মা হেসে ফেললেন। পাড়ার মেয়েরা কী ভাবল তা কে জানে। আম্মা বললেন:

'শোন তোমরা এতবড় মেয়ের কথাটা একবার শোন।' তারপর কুঞ্জুপাতুম্মার গালের তিলটা ছুঁয়ে বললেন:

'এই দেখ এটা কি?' তখন কুঞ্জুপাতুম্মা সব বুঝতে পারল। পাড়ার আর সব চার পাঁচ বছরের নগণ্য কুঞ্জুপাতুম্মাদের গালে ওর মত কালো তিল আছে তা তো ও কখনও শোনে নি। আম্মা অন্য মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন, তারাও বলল যে, কই তারা তো শোনে নি আর কারুর গালে কুঞ্জুপাতুম্মার মত কালো তিল আছে। তারপর আম্মা কুঞ্জুপাতুম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন:

'তোর গালের তিলের রঙটা কী?'

কালো তিলের রঙ তো কালো। কুঞ্জুপাতুম্মা বলল, 'কালো'।

আম্মা বললেন, 'তোর নানার হাতির রঙটা কী'? কুঞ্জুপাতুম্মা ভেবে দেখল—সাধারণত হাতির রঙ তো কালোই হয়। ও বলল, 'কালো'। আম্মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর গায়ের রঙ?' কুঞ্জুপাতুম্মা তো ফরসা'। ও বলল, 'ফরসা।'

আম্মা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর ফরসা গালে কালো তিল এল কেন?'

এইবার কুঞ্জুপাতুম্মা সমস্ত ব্যাপারটার অর্থ বুঝতে পারল। ওর কাছে সমস্ত গোপন রহস্য সোজা হয়ে গেল। ওর খুব আনন্দ আর গর্ব বোধ হতে লাগল। ও বলল, 'হ্যাঁ সত্যিই তো আমার নানার একটা হাতি ছিল।'

ওর আম্মা খড়মজোড়া পরতে পরতে বললেন, 'খুব বড় একটা দাঁতালো হাতি।'

শয়তান ইবলীস

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

কুঞ্জুপাতুম্মার বিয়ের কথাবার্তা যখন চলছিল তখন সে দুটো খবর শুনল।

ওর নানার সেই বড় দাঁতালো হাতিটা ছটা লোককে মেরে ফেলেছিল। এতে ওর খুব কষ্ট হল, হাতির ওপর বেশ রাগও হল। 'হতচ্ছাড়া হাতি' কথাটাও মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে সে রাগ বেশীদিন রইল না। হাতির মাহুত ছিল ছ-জন। তারা সব কাফের। একজনও মুসলমান মাহুতকে হাতিটা মেরে ফেলে নি। অবশ্য মাহুতদের মধ্যে মুসলমান কেউ ছিল কিনা তা ওর জানা ছিল না।

ওর আম্মা বললেন—'একটা হাতির মত হাতি ছিল' অর্থাৎ হাতিটা ওর নানার হাত থেকে কলা গুড় সব নিয়ে খেত। আম্মা আরও বললে—'তোর বাবা আমাকে বিয়ে করতে এসেছিল ওই হাতিতে চড়ে।'

কুঞ্জুপাতুম্মা মার কথা শুনে চট্ করে ভেবে নিল—আচ্ছা ওকে বিয়ে করতে যে ছেলেটা আসছে, সেও কি হাতির পিঠে চড়ে আসবে ?

কুঞ্জুপাতুম্মা অবশ্য কাকে বিয়ে করবে, কেন বিয়ে করবে এসব কিছুই ভাবে নি। ওর বিয়ের পরই ওর বাপজান মক্কায় হজে যাবেন। মক্কার মত পবিত্র পুণ্যময় জায়গায় মুহম্মদ নবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওখানে 'কাবা' নামে পবিত্র মসজিদও আছে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ হচ্ছে এই কাবা। কত পুরনো! ইব্রাহিম নবী আবার একে নতুন করে তৈরী করেছিলেন। কুঞ্জুপাতুম্মার বাপজান অবশ্য কোনও মসজিদ তৈরী করান নি। বাপজান হজ করে ফিরে

এলে তাঁকে হাজী ভট্টনটীমা নয়তো ভট্টনটীমা হাজী বলে ডাকা হবে। কুঞ্জুপাতুম্মা জিজ্ঞেস করল, ঃ

'আম্মা তুমিও যাবে ?'

আম্মা বললেন, 'কোথায় ?'

'হজে ?'

'হ্যাঁ।'

এ এক নতুন খবর। কুঞ্জুপাতুম্মা বলল ঃ

'আমাকে নিয়ে যাবে ?'

আম্মা হাসলেন—বললেন,

'সে তোর বরকে জিজ্ঞেস করবি—বিয়ে হোক।'

কুঞ্জুপাতুম্মা খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ও কিছু বলল না। কিন্তু মনে মনে ভাবল ওকে যে বিয়ে করবে তার সম্বন্ধে ও কিছুই জানে না। কেমন দেখতে ? অল্পবয়সী না বুড়ো ? কালো না ফরসা ? কিছুই ও জানে না। মোটমাট কেউ একজন আসছে ওকে বিয়ে করতে।

মেয়ে হয়ে জন্মালে তাকে যে-কোনও একজন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে। এ নিয়ম মুহম্মদ নবীর সময় থেকে চলে আসছে। অনেক, অনেক আগে আদম নবী হবা বিবিকে বিয়ে করেন। আদম নবী ও হবা বিবির আম্মা বা বাপজান ছিল না। তাঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্। পৃথিবীতে যত লোক জন্মাচ্ছে আর মরছে তাদের সকলের প্রথম আম্মা আর বাপজান হবা বিবি এবং আদম নবী। এঁদের আগে পৃথিবীতে কোন মানুষ ছিল না। কত কোটি কোটি বছর আগে আদম নবী এবং হবা বিবি এই পৃথিবীতে ছিলেন তা কুঞ্জুপাতুম্মার জানা নেই। আদম নবীর পরে আরও অনেক নবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন—নোয়া, ইব্রাহিম, দায়ুদ, মুসা যীশু, মুহম্মদ।

সবশেষের নবী হচ্ছেন মুহম্মদ। মুহম্মদের পর আর কোনও নবী জন্মগ্রহণ করবেন না। করার দরকারও নেই।

মুহম্মদ নবীর বড় মেয়ের নাম ছিল ফতিমা, লোকে বলে পাতুম্মা মুহম্মদ নবী খলিফা আলির সঙ্গে ফতিমা বিবির বিয়ে দিয়েছিলেন।

আলি খুব সাহসী, বীর আর বলবান ছিলেন। জুলফিকার নামে তাঁর একটা খুব বড় ঝকঝকে তলোয়ার ছিল। আল্লাহের আজ্ঞানুসারে আলি সেই তলোয়ার সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তাতে সমস্ত মাছের ঘাড় কাটা পড়ে। তাই তো মাছের ঘাড়ের দুপাশে কাটা। তারপর থেকে ইসলামে মাছ খাওয়া সিদ্ধ বলে গণ্য হয়।

কুঞ্জুপাতুম্মা আবার তার আগের ভাবনায় চলে গেল। আচ্ছা ওকে যে বিয়ে করতে আসছে সে কি বেশ হোমরা-চোমরা হবে? কে জানে? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে? তা ছাড়া মুসলমান যুবতীর ধর্মই এই যে, যা করতে বলা হবে তাই করবে, যা দেওয়া হবে তাই মাথা পেতে নিতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বা তাঁর রসুল মুহম্মদ কিছু বলে গেছেন কি না তা তার জানা নেই। মানে না বুঝলেও কোরান-এর কিছু কিছু অংশ ওর মুখস্থ। ওর আম্মা, বাপজান, ওর সেই নানা যাঁর একটা বড় হাতি ছিল—সকলেরই কোরান মুখস্থ। কোরানের অর্থ সকলের বোঝার সাধ্য নেই। পৃথিবীর সমস্ত গাছগুলোকে কলম করে আর সব সমুদ্রগুলোকে কালি করে যদি কোরানের অর্থ লেখা যায় তাহলে এক অধ্যায়ের অর্থ লেখার আগে গাছ সব শেষ হয়ে যাবে এবং সমুদ্রের জল সব শুকিয়ে যাবে। কোরান অতি পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থ কেউ লেখেন নি। আল্লাহ্ জিব্রাইল নামে দেবদূতের কাছে দৈববাণী করেন। জিব্রাইল আল্লাহের আদেশানুসারে পয়গম্বরের কাছে এই দৈববাণী প্রকাশ করেন। নবীর মাতৃভাষা আরবীতে কোরান লেখা হয়েছে কিন্তু নবী লিখতে পড়তে জানতেন না। আরব বলে এক রাজ্যের কথা কুঞ্জুপাতুম্মা শুনেছে। সেখানে মক্কা ও মদিনা নামে দুই পুণ্যস্থান আছে। মুহম্মদ নবী মক্কায় জন্মেছিলেন আর মদিনাতে দেহ রেখেছিলেন।

বাপজান এবং আম্মা হজে যাবার সময় মদিনাতে যাবেন। কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবলে, ওঁদের সঙ্গে যেতে দিতে কি কুঞ্জুপাতুম্মার না-জানা

বরটি রাজী হবে ? ওকে হজে যেতে দেবে কি দেবে না রাতদিন এই একটা চিন্তা হয়ে দাঁড়াল ওর। এমনি ভাবে সংশয়ের দোলায় ও যখন দুলছে তখন ও একদিন দেখতে পেল ওর বাপজান খুব রেগে গেছেন। চোখ লাল কিন্তু মুখে ঠাট্টামাখানো হাসি। বাপজান বলছেন : 'ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পায় নি।, ভট্টনটীমাকে জব্দ করতে এসেছে। আল্লাহ্ আর পয়গম্বর আমার সহায়। দেখিয়ে দেব কেমন করে ভট্টনটীমাকে ওরা খেলা শেখায়।'

কী খেলা কিসের জব্দ—কুঞ্জুপাতুম্মা কিছুই বুঝতে পারল না। পরে শুনল বাপজানের নামে নাকি একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা বেধেছে মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। মসজিদের ব্যাপারে বাপজানের নাকি আর কোনও হাত থাকবে না।

হে আল্লাহ্ তালা! একি কথা ? মসজিদে বাপজানের হাত না থাকলে আর কার হাত থাকবে ? গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে মান্য গণ্য লোকই তো মসজিদের কর্তা হবেন। আর তা হতে গেলে পয়সা চাই। কুঞ্জুপাতুম্মার বাপজানই হচ্ছেন ওদের গ্রামের সবচেয়ে পয়সাওলা লোক। গাঁয়ে যদি আবার একজনের বেশী পয়সাওলা লোক থাকে তাহলে মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আর ঝগড়ার শেষ থাকে না। মারামারি খুনখারাপি হওয়াও বিচিত্র নয়। পরে মামলা মকদ্দমা— মসজিদের ভিতরের ব্যাপার এমনি ভাবেই চলে। মসজিদের ভিতরের যত সব গণ্ডগোল, যতসব মামলা মকদ্দমা তা সব ওই শয়তান ইবলীসের কারসাজি। কুঞ্জুপাতুম্মা খুব ভালো করেই জানে যে ইবলীস না থাকলে দুনিয়ার কোথাও কোন গোলমালই থাকত না।

মসজিদেই প্রথম কুঞ্জুপাতুম্মা এই শয়তানের কথা শোনে। মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় অবশ্য ইবলীসের কথা ও শোনে নি। কেননা মুসলমান মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। একদিন রাত্রে সে ধর্মোপদেশ শুনতে গিয়েছিল, সেদিন মসজিদের মোল্লা 'ওয়াঅস' বলছিলেন। মেয়েদের জন্য মসজিদের সামনে একপাশে একটা প্যাণ্ডেল মত করা হয়েছিল। সেইখানে

বসে সর্বপ্রথম ও এই ইবলীসের কথা শুনেছিল। মোল্লা জোরে জোরে সুর করে করে এই শয়তানের কথা বলছিলেন। সমস্তটাই কুঞ্জুপাতুম্মার বেশ ভালো করে মনে আছে।

এই ইবলীস প্রথমে ছিল একজন প্রধান দেবদূত। আল্লাহের সঙ্গে স্বর্গে বাস করার সময় একটা ঘটনা ঘটল।

এ ঘটনা পৃথিবী এবং অন্যান্য সৃষ্টির আগের ঘটনা। সবার আগে আল্লাহ্ মুহম্মদ নবীকে সৃষ্টি করেন। তারপর অনন্ত কোটি যুগ চলে গেল। পরে তিনি পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সৃষ্টি করলেন। মুহম্মদ নবীর ঘামের তিন ফোঁটা দিয়ে পৃথিবীর এই অসংখ্য জীবজন্তুর সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে প্রথম মানুষ হচ্ছেন আদম নবী।

আদম নবীকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ও তার সঙ্গে দেবদূত এবং জিনকেও আদমের বন্দনা করতে বললেন। এদের মধ্যে সেই প্রধান দেবদূত মাত্র বন্দনা করলেন না। কারণ দেবদূতদের সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে। মানুষ আদম সৃষ্টি হয়েছে মাটি দিয়ে।

মাটি দিয়ে তৈরী যে মানুষ, তাকে আগুন দিয়ে তৈরী দেবদূতের বন্দনা করাটা কি ঠিক ? সেই প্রধান দেবদূত এই কথাই বললেন। কিন্তু আল্লাহ্ সে-সব শুনলেন না। তাঁর কথা না শোনার জন্য তিনি তাঁকে স্বর্গ থেকে বার করে দিয়ে শাস্তি দিলেন।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত সেই দেবদূতই এই হতভাগা শয়তান ইবলীস।

এই শয়তান সম্বন্ধে কুঞ্জুপাতুম্মা আরও কিছু জানে। স্বর্গ থেকে অমনভাবে বিতাড়িত হওয়ার জন্য এই শয়তানের মনে স্বাভাবিকভাবে আদম নবীর ওপর ঘৃণা জাগল, তাই সে আদম নবী এবং হবা বিবিকে ভুলপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। শুধু তাই নয়, সমস্ত সৃষ্টি বিশেষ করে মুসলিম জনগণকে ভুল পথ দেখিয়ে কাফের করে নরকের পাপী করে তোলার জন্যই তার প্রাণপণ চেষ্টা। এই শয়তান নানা রকম বেশ ধরে, নানা ভাষায় কথা বলে, নানান রূপ

ধরে ঘুরে বেড়ায়। যে কোন উপায়ে সমস্ত মানুষকে তার দিকে আকর্ষণ করাই তার উদ্দেশ্য। তার একটা কারণ আছে।

এই কারণটা অবশ্য ওর বাপজান ওকে বলেছেন। ইসলামের অনুমোদিত বেশবাসের একটা বিশিষ্ট রীতি আছে। ইসলামের একটা আলাদা পোশাক আছে। ছেলে হলে ডান দিকে কাপড় পরবে, মাথা কামিয়ে চকচকে করে রাখতে হবে। ধানক্ষেতে আল বাঁধার মত দাড়ি রাখতে হবে। মেয়ে হলে কান বিঁধিয়ে মাকড়ি পরতে হবে, কুপ্পায়ম্[১] পরতে হবে, মাথায় ঘোমটা দিতে হবে। চুল আঁচড়ানো যাবে তবে সিঁথি কাটা চলবে না।

এর উল্টোটা করেছিল একটি মুসলমান ছেলে। অর্থাৎ শুধু চুল রাখা নয়, বেশ ফ্যাশান করে ছেঁটে ছিল আবার সিঁথিও কেটেছিল।

বাপজান সেই ছেলেটাকে ডেকে নাপিত দিয়ে তার সব চুল ছাঁটিয়ে ফেলে বলেছিলেনঃ—

আল্লাহ্ আর মুহম্মদের আশীর্বাদে যতদিন ভট্টনটীমা বেঁচে আছে ততদিন ইসলামের রীতিনীতি এভাবে জলাঞ্জলি দেওয়া চলবে না।

এর মানেই হল, যারা চুল রাখে আর ফ্যাশান করে ছাঁটে তারা সব শয়তান ইবলীসের বন্ধু। তাই তাদের সম্পর্কে খুব সতর্ক হতে হবে। ইবলীস কখন মাথায় চড়ে বসে তার জন্যে মাথায় টুপিও পরতে হবে। টুপি না পরলে মাথায় পাগড়ির মত কিছু একটা বেঁধে রাখতে হবে।

তবে বাপজান টুপিও পরেন না, মাথায় পাগড়িও বাঁধেন না। নামাজ পড়বার সময় মাত্র বাপজান মাথায় ঢাকা দেন। আচ্ছা—বাপজান যখন মাথা খালি করে রাখেন তখন যদি শয়তান মাথায় চড়ে বসে। না, তা হবার ভয় নেই। ভট্টনটীমার কাছে আসার সাহস শয়তানের হবে না।

কুঞ্জুপাতুম্মা অবশ্য সব সময় মাথা ঢেকে থাকে। ওর আম্মাও। মাথা আঁচড়ালেও কাফের মেয়েদের মত সিঁথি কাটে না। এই

---

[১] কুপ্পায়ম মালয়ালী মুসলমান রমণীর ব্লাউজ।

শয়তানের সম্বন্ধে বাপজান আরও একটা গল্প বলেছিলেন। তা হচ্ছে এই—

আদিতে সৃষ্টি শেষে সমস্ত জীবগণের আত্মাকে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

'তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কে ?'

সকলেই বলল—'আমাদের সৃষ্টিকর্তা কেউ নয়।

আল্লাহ্ তখন সকলকে নানাভাবে শিক্ষা দিলেন। তবুও কেউ কিছু কবুল করল না। তাই দেখে আল্লাহ্ বললেন, 'আচ্ছা তোমরা জব্দ হও কিনা দেখছি।' তিনি তখন সকলকে খিদের জ্বালা যে কী জ্বালা তা বোঝালেন। সেই সময় থেকেই মানুষের পেটে খিদের সৃষ্টি। খিদের জ্বালা যে কী জ্বালা সকলেই তা বুঝতে পেরে কবুল করল— 'আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্।'

সেদিনের সেই সম্মতিপত্র একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। শেষবিচারের দিনে আত্মাদের বিচার করার সময় সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হবে পাথরকে। এই পাথরের নাম "হজরুল আসওয়াদ্"। মক্কায় কাবাতে এই কালো পাথর আছে। যাঁরা হজ করতে যান তাঁরা এই কালো পাথর ছুঁয়ে চুম্বন করেন। বাপজান আর আম্মাও এই পাথর ছুঁয়ে চুম্বন করবেন। কুঞ্জুপাতুম্মা কি হজে গিয়ে ওই পাথর ছুঁয়ে চুম্বন করতে পারবে ? যদি কোনও বাধা আসে তাহলে তার দোষ হবে ওই শয়তান ইবলীসের। হতভাগা সবসময় একটা না একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে।

কুঞ্জুপাতুম্মা মনে মনে প্রার্থনা করে ঃ 'আল্লাহ্! ইবলীসের হাত থেকে আমাদের দূরে রাখ।'

"জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ......"

হাতে পায়ে মেহেদীর রঙ্ লাগিয়ে চোখে সুর্মা দিয়ে সব সময় সেজেগুজে কুঞ্জুপাতুম্মা বসে থাকত। আশ্চর্য এক আশায় ওর দিন কাটছিল।

কে আসছে ? কার প্রতীক্ষায় ও বসে আছে ?

প্রথম প্রথম বিয়েটা একটা মজার ব্যাপার বলে ওর মনে হয়েছিল। বিয়ের পর পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে বেশ বাড়ির গিন্নী হবে। কানে সোনার মাকড়ি—বেশ ভারিক্কী চালে কথা বলবে। আম্মা আর বাপজানের সঙ্গে হজেও যেতে পারবে। শ্বশুরবাড়ি থেকে কি সে হজে যাবার অনুমতি পাবে ?

তবে বিয়ের যে সব সম্বন্ধ আসছিল তার একটাও আম্মা আর বাপজানের পছন্দ হচ্ছিল না। কোনটাই আনামকারের নাতনীর উপযুক্ত নয়। কারুর হয়ত অবস্থা ভালো নয়, কারুর হয়ত বংশ অত উঁচু নয়—এই সব নানা ফ্যাঁকড়া।

দিনগুলো এইভাবে একটার পর একটা গড়িয়ে চলল। কুঞ্জু-পাতুম্মার বয়সও বেড়ে চলল। তখনও ওর মনে একটা ছোট্ট ইচ্ছা জেগে আছে। যদিও খুব স্পষ্ট নয়। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি, একটা কাঁটার খচখচানি। ওর ভাবী স্বামীকে বিয়ের আগে একটিবার দেখবার ইচ্ছে। একবার দেখলেই ওর সাধ মিটবে।

কিন্তু এ ইচ্ছের কথা ও কাউকে জানাতে পারল না। মুসলমানের মেয়ে হয়ে কি এসব জানানো যায় ? ছিঃ ছিঃ, লজ্জার কথা ! তবু সেই ইচ্ছেটাই ওর মনের মধ্যে দিনের পর দিন বেড়ে চলল।

চুপচাপ বসে স্বপ্ন দেখা ছাড়া বেচারার আর কি-ই বা করবার আছে। বাড়িতে কাজের লোক গোটা পাঁচছয়—সবসময় চিৎকার গণ্ডগোল, হৈহৈ। এর মধ্যে থেকে আম্মার খড়মের খটখট খটখট শব্দ—বাড়ির ও দিকটায় বাপজানেরও। বাপজানের অফিস ঘরটায় সব সময় লোক ভর্তি। ওরা যেন কি সব বলাবলি করছে।

কুঞ্জুপাতুম্মার মাথায় ঢোকার মত ব্যাপারটা নয়। উকিল, সাক্ষী, মিথ্যে সাক্ষী, বিরুদ্ধ সাক্ষী এই সব কথা। কখনও কখনও অবশ্য ওর বিয়ের কথাও হচ্ছে। বিয়ের কথা শুনতে পেলে ওর দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু উন্মুখ হয়ে উঠত, কি কথা হচ্ছে তা শোনার চেষ্টা

করত। কেননা কাছে গিয়ে শোনার উপায় ছিল না। ও যদি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে অন্য লোকেরা জানতে পারবে যে ও বিয়ের কথা শুনতে এসেছে। তাতে ওর ভয়ানক লজ্জা। দমবন্ধ করে চুপিচুপি শুনতে গিয়ে অনেক সময় ও মুখ দিয়ে শব্দও করে ফেলে, আর নড়াচড়া করলে তো কথাই নেই। গায়ের গয়নার সব ঝনঝন শব্দ উঠবে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়—এত গয়নারই বা কী দরকার রে-বাবা! কুঞ্জুপাতুম্মা গয়না কিছু খুলেও রাখত কিন্তু ওকে দেখতে পাত্রের বাড়ির মেয়েরা যে কোনও সময়েই আসতে পারে তাই গয়না খুলে রাখবারও জো নেই।

পাত্রের বাড়ি থেকে গিন্নীবান্নী মেয়েরা সোনার গয়নায় গা মুড়ে ওকে দেখতে আসত। তাদের সব কতরকম প্রশ্ন, কতরকম সন্দেহ। কেউ কেউ ওর মুখ খুলে দাঁত পর্যন্ত দেখেছে, দাঁত সব ঠিক আছে, না পোকায় খাওয়া।

কুঞ্জুপাতুম্মার দাঁত একটাও খারাপ নয়। মুক্তোর মত ঝকঝকে সারিসারি দাঁত ওর। হাসলে ঝিলমিলিয়ে ওঠে।

কেউ কেউ আবার কুঞ্জুপাতুম্মা বোবা কিনা জানতে চায়। কেউ কেউ আবার ওর ইসলামের জ্ঞান কতটুকু তাও জানতে চায়। কতরকমের যে সব প্রশ্ন তার ঠিকানা নেই।

'আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

কুঞ্জুপাতুম্মা বলেঃ 'আল্লাহ্।'

'ক্যামর লক্ষণ কি কি?'

অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার লক্ষণগুলো কি কি?

এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কতকগুলো লক্ষণ দেখে তা বোঝা যাবে। লক্ষণগুলো সমস্ত কুঞ্জুপাতুম্মা বিস্তারিত ভাবে বলে যায়, বলে—নীচের লোকেরা ওপরে উঠবে, ওপরের লোকেরা নীচে নামবে, লোকে বেশী করে মিথ্যে বলতে শিখবে, আল্লাহ্ ও নবীর প্রতি বিশ্বাস কমে যাবে, ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। ছেলেরা আম্মা বাপজানের কথা শুনবে না। গুরুজনদের প্রণাম করবে না,

তাঁদের সম্মান দেখাবে না। মেয়েরা লজ্জা বিসর্জন দিয়ে স্বাধীন ভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে। কেউ কাউকে সম্মান দেখাবে না। কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না। স্নেহ ভালবাসা সব উবে যাবে, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বেড়ে যাবে, লোকের মন কঠিন ক্রূর হয়ে উঠবে। রাজা, রাজ্যশাসকেরা সব ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে, একজনের রাজ্য আর একজন ছিনিয়ে নেবার জন্য লোলুপ হয়ে উঠবে। ভয়াবহ সব যুদ্ধ শুরু হবে। কিন্তু তখনও পৃথিবী ধ্বংস হবে না, কারণ পৃথিবী ধ্বংস করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পূর্বেই মানুষ সব ভুলে যেতে শুরু করবে। এক ভয়ানক অবস্থা এগিয়ে আসবে···এমন সময় একদিন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে মানুষ যখন যে যার কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে তখন হঠাৎ তারা একটা শব্দ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পাবে—

'একি শব্দ! একি শব্দ!' বলে তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এ হচ্ছে—"সুর" নামে শিঙা বেজে ওঠার আওয়াজ।

ইস্রাফীল নামে এক দেবদূত এই শিঙা বাজাবেন। এই শিঙাটায় বাঁশির মত অনেকগুলো ফুটো আছে। পৃথিবীতে যত জীবজন্তু, পশুপাখি আছে তাদের গোনাগুন্তি ফুটোও এই বাঁশিতে আছে। এই শব্দ শুনে পৃথিবীর নানা জায়গার মানুষ যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করবে—'এ শব্দ কোথা থেকে আসছে ?'

এই শব্দ ক্রমে বাড়তে বাড়তে বজ্রনির্ঘোষের মত গুরুগম্ভীর হবে। জীবজন্তু পশুপাখি সব ভয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করবে। এই শব্দ আরও ঘোরতর হবে। তখন মানুষ, জীবজন্তু পশুপাখি সব দলে দলে মরতে শুরু করবে। তারপর পৃথিবীও কাঁপতে শুরু করবে আর হঠাৎ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়বে। সমুদ্রের জল ফেঁপে ফুলে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে মাটি যতদূর আছে সব ভাসিয়ে দেবে, পাহাড় পর্বত

সব ভেঙে লক্ষ লক্ষ টুকরো হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়বে। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হবে, আর আকাশও ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সব ঠাণ্ডা নিস্তেজ হয়ে কয়লা হয়ে যাবে। সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। সূর্য চন্দ্র গ্রহতারা দিনদুনিয়া কিছুই থাকবে না। শেষে, একেবারে শেষে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মাত্র অবশিষ্ট থাকবেন। তখন তিনি বলবেন—

'আমি আমি বলে অহংকার করেছিল যে সব রাজা আর অন্যান্য লোকেরা তারা আজ কোথায়?'

এইভাবে কোটি কোটি বছর তিনি মাত্র থাকবেন। তারপর আবার তিনি নতুন পৃথিবী তৈরী করবেন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র আবার তৈরী হবে। সমস্ত আত্মার আবার উদ্ধার হবে। তারপর আল্লাহ্ কি ভাবে শাস্তি দেন, কি ভাবে রক্ষা করেন তা সমস্ত কুঞ্জুপাতুম্মা সবিশেষ বর্ণনা করে শোনায়। ওর এ সব একেবারে মুখস্থ।

ওকে দেখতে এসে যারা এইসব প্রশ্ন করত তারা প্রায়ই আসত তাদের ছেলের বা ভাইয়ের সম্বন্ধ করতে। আহা—ওর যদি একটা ভাই থাকত, তাহলে ও বেশ গিন্নীবান্নীর মত মেয়ের বাড়ি গিয়ে এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত। ওকে তখন বেশ সকলে সমীহ করে চলত।

মুসলমান মেয়ের পক্ষে জানা যা দরকার তা সবই ওর জানা আছে। ও সুর করে কোরান আবৃত্তি করতে জানে। কোরান ছুঁতে হলে অঙ্গশুদ্ধির দরকার। প্রথমে ভালো করে স্নান করতে হবে নয়ত উজু করতে হবে। উজু করতে হলে কতকগুলো আরবী শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হাত, পা, মুখের ভিতর উপর, নাক, কান মাথার তালু সব তিনতিনবার শুদ্ধ জলে পরিষ্কার করতে হবে। কুঞ্জুপাতুম্মা নামাজ পড়তেও জানে। সুবহ, ফজর, অসর্, মগরীব, ইশা অর্থাৎ ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে, দুপুর, বিকেল সন্ধ্যা এবং রাত্রি এই পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়। এ ছাড়াও 'ইসলাম' কী, 'ইমান' বলতে কী বোঝায় তাও ও জানে। ওকে

হারিয়ে দিতে কেউ পারবে না। একদিন মেয়ে দেখতে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একজন গিন্নীবান্নী গোছের মহিলা জিজ্ঞেস করলেন :

'আয়েষা বিবি কে ?'

'মুহম্মদ নবীর স্ত্রী।'

'আয়েষা বিবির কান ফুটো ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'কত মাকড়ি ছিল তাঁর কানে ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল : 'জিব্রাইল স্বর্গ থেকে মুক্তো ঝোলানো দুল নিয়ে এসে পয়গম্বরের হাতে দিয়েছিলেন। পয়গম্বর তা আয়েষা বিবির কানে পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

কুঞ্জুপাতুম্মার কানে মুক্তোর ঝুরি নেই। ওর দুই কানে একুশটা সোনার বালার মত গোলগোল মাকড়ি আছে। আর তাদের প্রত্যেকটায় বটপাতার মত সোনার একুশটা ছোট ছোট পাতা লাগানো। বাতাস লাগলে মৃদুমধুর রিনিঝিনি শব্দ হয়।

ওর কানের পাতায় দুটো বড় দুল, তাতে দুটো বড় বড় সোনার পাতা ঝুলছে। গলায় সোনার হার, তাতে ছোট্ট ঝিঙের সাইজের একটা লকেট। আম্মার গলায় যেমন আছে সে-রকম নয়। বিয়ের পর পরতে হয়। হাতে ওর অনেকগুলো করে সোনার চুড়ি, তাতে সব সময় ঠুং ঠাং শব্দ। আঙুলে আংটি। বাপজানের হাতের তামার অংটির মত নয়। মুসলমান পুরুষেরা খাঁটি সোনা ব্যবহার করতে পারে না।

কুঞ্জুপাতুম্মার আঙুলের আংটিটা কিন্তু নিরেট সোনার। হাতির চোখের মত আংটির আকার। কোমরে সোনার ভারী মোটা একছড়া গোট, পায়ে সোনার মোটা মল। চলবার সময় ঝমঝম শব্দ হয়। কোথা থেকে যে শব্দটা বের হয় তা কুঞ্জুপাতুম্মা জানে না। মলের চুটকিগুলোর মধ্যে সোনার টুকরো না পাথরের টুকরো আছে যার থেকে এরকম শব্দ বেরোয়—কে জানে কি !

কুঞ্জুপাতুম্মার কাজকর্ম নেই, তাই ও শুধু চুপ করে বসে থাকে। খিদে নেই তবু খেতে হয়, ঘুম নেই তবু শুতে হয়। ওদের বাড়ির উঠোনে চাঁদনি রাতে এক এক সময় ও বসে থাকে। মনে কেমন যেন একটা আলতো বিষণ্নতা। কেন যে মনটা থেকে থেকে বিষণ্নতায় ভরে ওঠে তা ও নিজেই জানে না। ভাবে এমনিই বোধহয় মনটা খারাপ লাগছে। ওর তো সবই আছে, ওর মন খারাপের কি কারণ থাকতে পারে। ও দাঁড়িয়ে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে চেষ্টা করে। ওকে উঠোনে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আম্মা ওকে ডাকেন। অমনভাবে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক নয়। যদি কেউ দেখে ফেলে।

'আহাজত্ কে আম্মা ?'

আম্মা বলেন, 'শয়তান এবং জিন।'

আকাশে উড়ে যাওয়া কোন অদৃশ্য প্রাণী যদি ওকে দেখে ফেলে।

আমরা যেমন দেখি আকাশ কি ঠিক তেমন শূন্য ? আকাশে কতরকম কিছু রয়েছে যা আমরা চোখে দেখতে পাই না। শয়তান ও জিন ছাড়াও ইবলীসও আকাশ দিয়ে উড়ে যায়। উড়ে যেতে যেতে কুঞ্জুপাতুম্মাকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে অনায়াসে তারা ওর উপর ভর করতে পারে। তাই কুঞ্জুপাতুম্মা আম্মার ডাকে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে যায়।

মানুষ, দেবদূত, শয়তান যে কেউই ওকে দেখুক ওর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ও যে মুসলমানের মেয়ে!

এমন ভাবে বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকতে ওর মোটেই ভালো লাগে না। আল্লার দেওয়া এই দেহ-জুড়ানো বাতাস, এই মন-জুড়ানো সূর্যের আলো এসব কিছুই ওর জন্যে নয়। মনে মনে বেচারা হাঁপিয়ে ওঠে, কিসের একটা আকুলতা ওকে যেন ছটফটিয়ে তোলে। কুঞ্জুপাতুম্মার বয়স হচ্ছে, সেই সঙ্গে ওর চিন্তা ভাবনাও বেড়ে চলছে। স্বপ্ন দেখে ওর রাত ভোর হয়। সে সব স্বপ্ন

কাউকে বলার নয়। সে সব স্বপ্ন ওর দেহের অণুপরমাণুতে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এইভাবে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কুঞ্জুপাতুম্মার বয়স হল একুশ আর এই সময়েই ওর জীবনে ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা।

ওর বাপজান ওর গা থেকে, ওর আম্মার গা থেকে সমস্ত গয়না এক-এক করে খুলে নিলেন, আর তা সব গেল মকদ্দমার পিছনে। কুঞ্জুপাতুম্মার কানের, গলার, কোমরের, পায়ের সব গয়না গেল। বাপজান এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা শুধু মকদ্দমা কোর্ট আর বাড়ি—এই নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিলে। মকদ্দমা চলল তো চলল, অনেকদিন গড়িয়ে চলল। তারপর রায় বের হল। বাপজান হেরে গেলেন। অপমান আর পরাজয়ের কালি মেখে এখন তাদের এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কোথায়? কে জানে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ যেন একটু আগেই উঠেছিল।

যে বাড়িতে প্রথম সে পৃথিবীর মুখ দেখেছিল, যেখানে সে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল, যে বাড়ির প্রত্যেকটি কোঠায় সঞ্চিত রয়েছে কতরকমের সুখদুঃখ মাখানো স্মৃতি, সেই বাড়ির কাছ থেকে কুঞ্জুপাতুম্মা শেষ বিদায় নিল। ওরা সকলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামের পথে পা বাড়াল। দীর্ঘকায় বাপজান সামনে, মাথা নিচু করে চোখের-জলে-ভাসা আম্মা, আর কুঞ্জুপাতুম্মা সকলের শেষে। ওর চোখে কিন্তু নেই একফোঁটা জল বা নেই কোনও উচ্ছ্বাস কি আবেগ। গ্রামের লোকের চোখের সামনে দিয়ে প্রকাশ্য পথের উপর দিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের সামনে নদীর ধারে এসে তারা পৌঁছল।

ওদের এমনভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে আসায় কোথাও কিছুই ঘটল না কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। চাঁদের আলোয় নদী, নদীর ধার, বালুচর সব ঝিকমিক করতে লাগল। নদীতে লোকেরা ঠিক আগের মতই স্নান করছিল, তীরে বালিতে বসে কতকগুলো লোক গল্প করছিল।

কুঞ্জুপাতুম্মা আম্মা বাপজানের পিছনে পিছনে হেঁটে চলল। কোথায়—কে জানে? হাঁটতে হাঁটতে ওর পা ব্যথা করছিল। দেহে যেন ওর এক-ফোঁটাও শক্তি নেই কিন্তু ও ভাবছিল কি আশ্চর্য এই পৃথিবী—কি আশ্চর্য এই নির্জন গ্রাম্য পথ! চাঁদের আলোয় কুঞ্জুপাতুম্মা সকলের পিছনে হাঁটতে লাগল। কোথায় ওদের লক্ষ্য ও জানে না। এই কালরাত্রির কি অবসান হবে না?

পুরনো খড়ম-জোড়া

কুঞ্জুপাতুম্মা কিন্তু খুশী হয়েছে। আশ্চর্য! এত ক্ষতির মূল্যে পেলে সে এই খুশী। কত বড় একটা বিপদ ঘটে গেল। তবু ও খুশী। এইবার এখন সে বাইরের লোকজনকে দেখতে পাবে, খোলা বাতাস গায়ে লাগবে, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। সূর্যের আলো দুচোখ ভরে দেখতে পারবে, চাঁদের আলোয় অবগাহন করতে পারবে। ইচ্ছেমত ছুটোছুটি করতে পারবে, লাফ-ঝাঁপও দিতে পারবে, গান না জানুক, ইচ্ছে হলে গানও গাইতে পারবে। মোটকথা এখন তার অবাধ স্বাধীনতা। এখন দেবদূত, শয়তান যে কেউ আসুক না কেন—আর ভয় নেই তার।

কিন্তু আশ্চর্য! কেউ এল না, যাদের পয়সা নেই তাদের কেউ চায় না বুঝি? শয়তানও না!

তবে ওর এই ধারণা বেশীদিন রইল না। পয়সা না থাকলেও ওর যৌবন আছে, সৌন্দর্য আছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে ওর দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাও ও বুঝতে পেরেছে। কেউ কেউ ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেই ইশারা করছে, পয়সার লোভও কেউ কেউ দেখিয়েছে।

এ সব যে কিছুই ভালো নয় তা কুঞ্জুপাতুম্মা বেশ ভালো করেই জানে কিন্তু ও কি করতে পারে, ওদের কিই বা বলতে পারে। ও কারুর দিকে না তাকিয়ে ওদের বাড়ির পাশের তেঁতুল গাছটার তলায় গিয়ে বসেছে। কখনও কখনও শালুকফুলে ভরা পুকুরটার কাছে গিয়েও দাঁড়িয়েছে। পুকুরের জল বেশ গভীর, তাতে সাদা আর লাল শালুকফুলে ভর্তি। তাদের সুন্দর সবুজ চকচকে পাতাগুলো জলের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, ফুলগুলোর ওপর দিয়ে

ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা ওর খুব ভালো লাগে তাই যখনই সময় পায় তখনই ও ওখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

বাড়ি কাছেই কিন্তু ওটা ঠিক বাড়ি বলে কুঞ্জুপাতুম্মার মনে হয় না। লাল ইঁট দিয়ে তৈরী পুরনো একটা ছোট্ট বাড়ি চুনকামের অভাবে দেখায় ঠিক যেন চামড়াছাড়ানো বকরী দুম্বার গায়ের মত। ছোট দুটো ঘর আর একটা রান্নাঘর। ওপরটা খড় দিয়ে ছাওয়া। বাড়িতে আসবাবপত্র নেই বললেই হয়। দু-তিনটে মাদুর আর বালিশ, সকলের কাপড় রাখার একটা বাক্স আর দু-তিনটে ডিবিয়া।

রান্নাঘরে দুটো তিনটে মাটির হাঁড়ি, কলসী। তরকারি রান্না হয় মাটির হাঁড়িতে আর ভাত খায় মাটির বাসনে।

খাওয়ারও বিশেষ কিছু নেই।

আগের বাড়ি থেকে ওরা কিছুই আনতে পারে নি, শুধু খালি হাতে চলে এসেছে। তবে নানার সেই বড় হাতির দাঁতের বুটি লাগানো খড়ম জোড়া আম্মা যেন কি ভাবে নিয়ে এসেছেন। আসবার সময় পথে আম্মার হাতে দেখেছিল কিনা কুঞ্জুপাতুম্মার মনে পড়ে না।

এই খড়ম পায়ে আম্মা সব সময় 'খটখট' 'খটখট' শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর দিনরাত্তির একটা না একটা নিয়ে খিটিমিটি করছেন। মুখে কিন্তু মুখভর্তি পানটি আছে আজও।

বাপজান পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি বাপজানের সব চুলগুলো পেকে গিয়েছে। আজকাল বাপজান বেশী কথাবার্তা বলেন না। সব সময় কেমন যেন আনমনা দৃষ্টিতে কোন একদিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন।

'এ সবই আল্লা আর পয়গম্বরের খেলা।' বাপজান বলেন, 'জীবনে একবারও নামাজ পড়তে ভুলি নি। রমজান মাসে উপোস করেছি, জকাত দিয়েছি, যখন যা দরকার তাই তাই করেছি। তবুও—।'

তাহলে? তবুও এমন হল কেন? কুঞ্জুপাতুম্মা জানে কিছুই হয় নি। যদি কিছু খারাপ হয়ে থাকে তার জন্যে দোষী নিশ্চয়ই কেউ আছে কিন্তু সে দোষী কে? বাপজানের দোষ ভাবতে মন সায় দেয় না। আম্মা, ফুফী ফুফাদেরও দোষ ও দিতে পারে না। কোরান ছুঁয়ে যারা সাক্ষী দিয়েছে, হোক সে মিথ্যে তাদেরই বা সে দোষ দেয় কেমন করে? মানুষের মধ্যে কারুর দোষ কুঞ্জুপাতুম্মা দেখতে পায় না। যথার্থ দোষী হচ্ছে সেই শয়তান ইবলীস।

কুঞ্জুপাতুম্মা তাই প্রার্থনা করে।

'আল্লাহ্, এবার আমাদের ইবলীসের শয়তানী হতে রক্ষা কর।'

প্রার্থনা ছাড়া ও আর কিই বা করতে পারে।

ও এই ইবলীসের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই ইবলীস ওদের কি ভাবেই না ভুগিয়েছে আর এখনও ভোগাচ্ছে।

কুঞ্জুপাতুম্মার বাপজান যে সব নারকেল গাছ, ধান চাষ থেকে রোজগার করছিলেন সে সব তাঁর নিজের নয়। এই সব ধানক্ষেত নারকেল বাগান আর আগের সেই বড় বাড়িটা—সব বাপজান আর বাপজানের সাত বোনের মিলিয়ে ছিল।

তারাই নালিশ করেছিল। বোনেরা বলেছিল:

'একদিন রাত্রে চুপিচুপি আমাদের আম্মাকে আমাদের ওই ভাই ভট্টনটীমা নিয়ে যায়, পরের দিন কাছারিতে আম্মাকে দিয়ে আমাদের অংশও তার বলে লিখিয়ে নিয়ে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।' এই বলে সাত ফুফী একসঙ্গে বাপজানের নামে মকদ্দমা দায়ের করে।

বাপজান বলেছিলেন: 'আমার আম্মা আমাকে তাঁর নিজের ইচ্ছেমত সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন।' এর ওপর চলেছে মকদ্দমা। অনেকদিন ধরে মকদ্দমা চলেছে। দুপক্ষেরই অনেক পয়সা নষ্ট হয়েছে। বড় বড় উকিল দুপক্ষের হয়ে মকদ্দমা চালিয়েছে। জিতবার জন্য দু পক্ষই পীরের দরগায় দরগায় অনেক শিন্নী চড়িয়েছে, দুদিক থেকে বেশ বাছাই করা মিথ্যে সাক্ষীও যোগাড় করা হয়েছিল। মকদ্দমায় বাপজানের যখন জয় নিশ্চিত হয়ে আসছিল তখন এল

এক নতুন যুক্তি। বিপক্ষ থেকে বলা হল, ভট্টুনটীমার আম্মার মাথা খারাপ ছিল। স্থির বুদ্ধি নিয়ে তিনি ভট্টুনটীমার নামে সব লিখে দেন নি। যে লোককে মাটির তলায় কবর দেওয়া হয়েছে তাকে তুলে এনে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সত্য-মিথ্যার যাচাই করা কি সম্ভব? তাই ও-পক্ষের সাক্ষীরা যখন সাক্ষ্য দিল যে, 'ভট্টুনটীমার আম্মার মাথা খারাপ ছিল', তখন আর বলার কিছুই রইল না।

ভট্টুনটীমার আম্মার মাথা খারাপ হোক বা না হোক তার সম্পত্তিতে তার মেয়েদের হক আছে। এমনি ভাবে জটপাকানো এই মকদ্দমার সত্যি-মিথ্যে সম্বন্ধে ঠিক করে কুঞ্জুপাতুম্মার কিছু জানা নেই। তবে সবই এই সেই শয়তান ইবলীসের কারসাজি তা সে জানে, ওই হতভাগাই মকদ্দমায় বাপজানের বিপক্ষে রায় দিইয়ে দিয়েছে। মসজিদের দেখাশোনার ব্যাপার আর নানীর পাগলামির ব্যাপার—এই দুই মকদ্দমা চালাতে গিয়ে বাপজান ফতুর হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জায়গা ধারে দেনায় গেল। বাপজানের কপালে শেষ পর্যন্ত জুটল রাস্তার ধারে এই পুরনো ভাঙাচোরা জায়গাটা।

খড়ে ছাওয়া ছোট্ট একটা বাড়ি, নয়টা নারকেল গাছ, চারটে সুপুরি গাছ আর একটা তেঁতুল গাছ, একটা কুয়ো আর তেঁতুল গাছের পাশে শালুক ফুলে ভরা ওই পুকুরটি। পুকুর দেখে কুঞ্জুপাতুম্মা প্রথমে খুব খুশী হয়েছিল। এই প্রথম সে শালুকফুলে ভরা পুকুর দেখছে। সাদা আর লাল ফুলগুলো সব কুঞ্জুপাতুম্মা এক এক করে গুনে দেখে। কিন্তু কোনদিনই ও ফুলগুলো গুনতি করে শেষ করতে পারে না। একদিক থেকে গুনতে আরম্ভ করার পরই বাড়ির ভিতর থেকে হয় বাপজান, নয় আম্মা কেউ না কেউ ডাকবেন। কিন্তু বড় সুন্দর দৃশ্য! তবে এই মনোহর দৃশ্যের মধ্যেও কেমন যেন একটা ভয়-জাগানো, কেমন যেন একটা গা সিরসির করা ভাব—যদিও স্পষ্ট করে কিছু ব্যক্ত নয়, তবুও ঃ

একদিন এখানে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। তারপর থেকে ও

স্নান করতে যেত ওদের পাশের আঙ্গিনার কুয়োতে। ওখানে একটা ছোট বাড়িও আছে। এই বাড়িটায় কেউ থাকত না। নদীতে স্নান করার জন্য কখনও কখনও শহর থেকে কেউ এই বাড়িটা ভাড়া নিত। তখন কুঞ্জুপাতুম্মা ওই দিকে যেত না। এই কুয়োর জলটা খুব ঠাণ্ডা। কাছেই একটা বেলফুলের গাছ। তাতে ধবধবে সাদা সুগন্ধ বেলফুল সবসময় ফুটে রয়েছে। কুঞ্জুপাতুম্মা স্নান করতে আসার সময় এক সঙ্গে অনেক ফুল তুলেছিল। মাথায় গোঁজার জন্যে নয়। মুসলমানের মেয়ে হয়ে জন্মালে মাথায় ফুল গোঁজা যায় কি না যায়, তা ওর জানা নেই কিন্তু বেলফুল ও খুব ভালবাসে, তাই তুলেছিল এবং ওখানে বসে বসে এমনিই ও ফুলের মালা গাঁথছিল। ওখানে চুপচাপ বসে থাকতেও সুখ। কেউ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে না। জায়গাটা নির্জন, আর আশপাশ থেকে বেশ একটু উঁচুতে। সামনে নীচের দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, তার ও-পাশে ধানের ক্ষেত। তার ও-দিকে কোন্‌দিকে যেন নদী। ওখানে গিয়ে স্নান করতে হলে সদর রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া মেয়ে কি করে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে স্নান করতে যায়? আর ওদের বাড়ির কুয়োর কাছে কোন ঘেরাও নেই, মাথার ওপরেও কোনও আচ্ছাদন নেই।

তাই একদিন কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবল যে পুকুরে গিয়ে স্নান করবে; কেউ দেখতে পাবে না এমন সময়। সেদিন দুপুর প্রায় গড়িয়ে এসেছিল, রোদের তাপও খুব বেশী হয়ে উঠেছিল। কুঞ্জুপাতুম্মা তোয়ালে নিয়ে পুকুরের দিকে চলল। কুপ্পায়ম আর মুণ্টু খুলে ঘাসের ওপর রেখে তোয়ালেটা জড়িয়ে নিল।

আস্তে আস্তে ও পুকুরে নামল। বুকজল অবধি। তারপর দু-তিনবার ডুব দিয়ে গা ঘষতে লাগল। হঠাৎ জলের দিকে চোখ পড়তে দেখে কি যেন ছোট্টমত একটা কালো জিনিস ওর দিকে ছুটে আসছে।

'ওঃ আম্মা, জোঁক জোঁক।'

ও তাড়াতাড়ি পুকুরেরর পাড়ে উঠে গা মুছতে লাগল তারপর হঠাৎ দেখে ওর উরুতে কি যেন একটা জিনিস—একটা জেঁাক ওর উরুতে এঁটে লেগে রয়েছে। দেখে ওর গা ভয়ে আর ঘেন্নায় সিরসিরিয়ে উঠল। জেঁাকটা তুটো মুখ দিয়ে ওর রক্ত শুষতে আরম্ভ করেছে।

'ও আম্মা, ও বাপজান তাড়াতাড়ি এস, আমায় জেঁাকে খেয়ে ফেলল, ছুটে এস' বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে করলেও সে তা পারলে না ; কি করে চিৎকার করে ডাকবে ? গায়ে তখন ওর কুপ্পায়ম নেই, মুণ্টু নেই।

বেচারী জেঁাকের কামড়ে অস্থির হয়ে ওই অবস্থায়ই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে পেল জেঁাকটা খুব করে ওর রক্ত খেয়ে মোটা হচ্ছে। রক্ত খেয়ে মোটা হয়ে একদিক থেকে মুখ তুলে নিয়ে জেঁাকটা ঝুলছে দেখে ওর ভীষণ ঘেন্না করল। নড়লে জেঁাকটা ওর আর একটা হাঁটুর সঙ্গে ঘষা লেগে যাবে। ও দাঁতে দাঁত চেপে রোদে ঘেমে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। জেঁাকটা রক্ত খেয়ে গোল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে পর ও মুক্তি পেয়ে খুশীতে লাফিয়ে উঠল।

হাঁটুতে রক্ত লেগে রয়েছে, একটু একটু করে রক্ত পড়েছেও। কুঞ্জুপাতুম্মা পুকুর থেকে হাতে করে জল নিয়ে রক্তটা ধুয়ে ফেলল।

সত্যি জেঁাকটাকে নিয়ে এখন ও কি করে ? জেঁাকটার ওপর ওর যেমন রাগ হচ্ছে তেমনি ঘেন্নাও হচ্ছে। ওকে আচ্ছা করে বকে দিলে ঠিক হয় কিন্তু কি বলে বকুনি দেবে ?

'শয়তান তুই আমার সব রক্ত খেয়ে ফেলেছিস'—এই বলে কুঞ্জুপাতুম্মা জেঁাকটাকে মেরে ফেলবে ভাবল। কিন্তু কি করে মারে। জেঁাকটার নিশ্চয় মা বাবা আছে। মেয়ে জেঁাক, না ছেলে জেঁাক তাই বা কে জানে। মরুকগে—ওর বাড়িতে ওকে ছেড়ে দিই।

'জেঁাক এবার থেকে আর কাউকে কামড়ে রক্ত খাস নি, বুঝলি?

রক্ত খেলে তুই যখন মরে যাবি তখন আল্লাহ্ তোকে নরকে ঠেলে দেবেন—বুঝলি ?' বলে ও একটা ছোট কাঠি দিয়ে সাবধানে জোঁকটাকে তুলে আস্তে আস্তে জলে ফেলে দিল। ও মা, কি কাণ্ড! জোঁকটার অপেক্ষায় যেন বসে ছিল একটা শোল্ মাছ। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোল মাছটা জোঁকটাকে খেয়ে ফেলল।

কুঞ্জুপাতুম্মা উঁকি মেরে দেখল একটা নয় তুটো মাছ। 'ও বাবা, এ যে দেখি কর্তা গিন্নী তুজনেই!' তাই নয় শুধু, সঙ্গে ছেলেপিলেরাও রয়েছে। ছোট ছোট বাদামী মাছগুলো জলের মধ্যে লালচে কালির গুঁড়োর মত দেখাচ্ছে,

'শোল মাছ, তুই কেন জোঁকটাকে খেয়ে ফেললি রে? দেখবি তোর এতে ঠিক পাপ হবে।'

মানুষ যখন শোল মাছ খায় তখন যে পাপ হয় তা কুঞ্জুপাতুম্মার মনে হয় না। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোল মাছের সংসারটাকে দেখতে লাগল। মাছ তুটোর চোখগুলো দেখলে মনে হয় ওদের কোনও দয়া-মায়া নেই। কানকোর পাশ দিয়ে জল আসছে যাচ্ছে। কানকোর ওই কাটাটা আলির জুলফিকার তলোয়ার দিয়ে কেটে গিয়েছিল।

ওই বড় শোল মাছটা কেমন করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখ, যেন ওকে পেলেই কপ্ করে খেয়ে ফেলবে।

ও চুল নিংড়ে হাত দিয়ে চুলগুলো আঁচড়াতে আঁচড়াতে শালুক-ফুলে ভরা পুকুরটার এ-পাড় ও-পাড় দেখল।

ফুলগুলো ঠিক আগের মতই সাদা আর লাল কিন্তু এগুলোর তলায় রয়েছে মানুষের রক্ত-শোষা জোঁক আর সেই জোঁককে কপ্ করে খেয়ে ফেলার জন্যে ওত পেতে বসে আছে শোল মাছ। এসব জেনেও কিন্তু শালুকফুলের কোনও রাগ বা তুঃখ নেই। উপরন্তু কুঞ্জুপাতুম্মার মনে হল ফুলগুলো যেন বাতাসে হেলে তুলে হেসে হেসে ওকে টিটকারি দিচ্ছে। এই-রকম ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এল শালুকফুলে ভরা পুকুরের আর একজন অধিবাসী।

একটা বড় ঢোঁড়া সাপ না কি ইনি সাপ ? তলার দিকটা সাদা, জলে আলোড়ন তুলে সোঁ করে গিয়ে সাপটা একটা পদ্ম পাতায় উঠে মাথাটা জলের মধ্যে রেখে শুয়ে পড়ল। তারপর কপ্ করে কি একটা ধরে মাথাটা তুলল। আহা, একটা ছোট্ট পুঁটিমাছ, বেচারা! মাছটা কাঁদল না, চিৎকার করল না শুধু সাপের গ্রাস থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য লেজ নাড়িয়ে ছটফট করতে লাগল। মাছটার কষ্টে একটুও বিচলিত না হয়ে ঢোঁড়াটা মাছটাকে খেয়ে ফেলে ঠিক আগের মত আরও মাছ ধরার আশায় বসে রইল।

ভাল করে লক্ষ্য করে কুঞ্জুপাতুম্মা দেখতে পেল জলের মধ্যে আরও অনেক অধিবাসী। কচ্ছপ, চাঁদা মাছ, ল্যাঠা মাছ, ব্যাঙ্—বাবা কত সব প্রাণী!

ফুলগুলো ঠিক আগের মতই মৃদুমন্দ হাসছে। সব মিলিয়ে এই শালুকফুলে ভরা পুকুরটায় একটা সৌন্দর্য আর একটা কেমন যেন ভয়াবহতাও।

এই ঘটনার পর কুঞ্জুপাতুম্মা যখনই ওই পুকুরটার কাছে গেছে তখনই ওর মনে হয়েছে ও যেন গেছে এক সখীর কাছে—যাকে ও ভয়ও করে, ভালও বাসে।

কুঞ্জুপাতুম্মার কোন কাজ নেই। কাজ অবশ্য অনেকই আছে—সংসারের সব কাজই আছে কিন্তু কাজ করতে ও জানে না যে। করে নি—শেখে নি জীবনে। সে ছিল একরকম বন্দী জীবন। এখন স্বাধীনতা ওর যথেষ্ট আছে কিন্তু এই স্বাধীনতায় কি লাভ? রাঁধতে গেলে উনুনে আগুন দিতে ও জানে না। আম্মাও এসব কাজে রপ্ত নন। বাপজানকেই খাওয়ার যোগাড় করতে হবে আর তা রেঁধে দিতেও হবে।

‘মেয়ে হয়ে জন্মালে যে করে হোক উনুনে আগুন দিতে শিখতে হয়,’ বাপজান বলবেন।

বাপজানকে এইরকম ভাবে বলতে শুনলে কুঞ্জুপাতুম্মা লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে যায়। তবে বাপজান এগুলো অবশ্য আম্মাকে

উদ্দেশ্য করেই বলেন, তাকে বলেন না। আম্মা কিন্তু সেই খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে খটখট খটখট শব্দ করতে করতে বলেন ঃ

'আমি আনামকারের মেয়ে। ঝি-গিরি করতে আসি নি।'

বাপজান এর পর আর কিছু বলেন না।

খাওয়ার আগে আম্মার হাতে হাত ধোওয়ার জল ঢেলে দিতে হবে, নইলে আম্মা ভাত মুখে তুলবেন না। ওই ভাবেই বসে থাকবেন।

বাপজান রেগে টঙ হয়ে দেখেন এসব। কুঞ্জুপাতুম্মা আম্মার হাতে জল ঢেলে দেয়। আম্মা তখন বলেন ঃ

'তার নানার একটা হাতি ছিল, এই এত বড় একটা দাঁতালো হাতি।'

বাপজান একটা কথাও বলেন না। তবে আম্মা যখন খুব বেশী বলতে শুরু করেন তখন বাপজান গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন ঃ

'তোমার মুখ সামলাও।'

আম্মা বলেন, 'নইলে আমাকে কেটে ফেলবে নাকি? আমি আনামকারের মেয়ে, আমার লাইস্ন আছে।'

অর্থাৎ আম্মার যা খুশী বলার লাইসেন্স আছে।

কুঞ্জুপাতুম্মা তখন বলে ঃ 'লক্ষ্মীটি আম্মা—তুমি একটু চুপ কর।'

'হারামজাদী, তোর জন্যেই আজ আমাদের এই শনির দশা'—আম্মা বলেন ঃ

ওঃ, তাহলে বেচারা ইবলীসের কোনও দোষ নেই। কুঞ্জুপাতুম্মার দুঃখের সঙ্গে হাসিও পায়। তবে এইভাবে হাসার দিন আর বেশী রইল না। ওর মনের মধ্যে এক ভীষণ ভয় ঢুকেছে—বাপজান কখন না জানি আম্মাকে খুন করে বসেন। যা কাণ্ড আরম্ভ করেছেন আম্মা!

হাওয়া বইল কিন্তু পাতা ঝরল না

মানুষ এইভাবে বদলে যায় কেন একথা ভেবে ভেবে কুঞ্জুপাতুম্মা তার দিশে খুঁজে পেল না। বয়স বেশী হলেই স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনকে দেখতে পারে না। সত্যি এমন হয় কেন? সব বাড়িতেই আম্মা বাপজান তার আম্মা বাপজানের মত ব্যবহার করে নাকি? দুজনের মধ্যে সব সময় চুলোচুলি, একজন যেন আর একজনের চোখের বালি। আম্মা বাপজানের এই ঝগড়া দেখতে দেখতে কখনও কখনও কুঞ্জুপাতুম্মার হাসিও পায়। কিন্তু ও হাসে না। ওর মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে। ঘরে ঠিকমত খাবার নেই, কাপড়চোপড়ের কথা তো বলার জো নেই। একই পুরনো কাপড় জামাগুলো কেচে কেচে পরে—সেগুলোর রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। এর জন্যে কাকেই বা সে দোষ দেবে?

সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার এই যে, ওদের সাহায্য করার কেউ নেই। ওদের এই তিনটি প্রাণীর দিকে তাকিয়ে 'আহা' বলবারও কেউ নেই। যখন পয়সা ছিল তখন সব ছিল, কত আত্মীয় স্বজন। গ্রামের সব লোকই ওদের কাছে এসে কত ভালো ভালো কথা বলত, যেন কত আপনার লোক। আর আজ? কেউ নেই। হাসিও পায় দুঃখও লাগে। সবাই তখন হয় ফুফা নয় চাচা যাহোক একটা সম্বন্ধ পাতাতে চাইত। আজ আর সম্বন্ধ পাতানোর কেউ নেই। আজ মাত্র ওরা তিনজন। এই তিনজনের মধ্যে আবার আম্মা আর বাপজানের মধ্যে চুলোচুলি। আম্মা বাপজানকে যেন দুচক্ষে দেখতে পারেন না। বাপজান যাই করেন আম্মা তাতে দোষ দেখতে পান, অমনি তাই নিয়ে চেঁচামেচি, বকুনি। তাও যদি আস্তে করেন। আম্মা এমন চিৎকার করেন যে রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত শুনতে পায়। গ্রামের সব

লোকেরা এর জন্যে হাসি ঠাট্টা করে। বাপজানের নতুন নতুন মজার নাম বের করেন আম্মা রোজ রোজ। এইভাবে আম্মা একদিন বাপজানের নাম দিলেন "চেম্মীনটীমা।"

বাপজান কিন্তু চেম্মীন মানে চিংড়ি মাছ বিক্রি করার চেষ্টা কোনদিন করেন নি। যে সব কাজে বেশী পয়সা লাগে না সেই সব কাজই বাপজান করতে চেষ্টা করেছেন। মধ্যে একবার শুঁটকি মাছ বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে বাপজানের এই ব্যবসা করতে মোটেই ভালো লাগে নি।

গায়ে মাছের গন্ধ, বাড়ির চারপাশে মাছের আঁশটে গন্ধ, তবু চেষ্টা করেছিলেন। সমস্ত মাছ একটা ঝুড়িতে করে মাথায় বয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে কোনও বাজারে বিক্রি করতেন। ফেরার সময় চাল, তরিতরকারি আর কিছু মাছও তার সঙ্গে কিনে আনতেন। কুঞ্জুপাতুম্মা আগে আগে মাছ মাংস দুইই খেত। পরে ও দুটোই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।

যেদিন ও শোল মাছটাকে জোঁক খেতে দেখল সেদিন থেকেই ও মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। বাপজান যখন মাছের ব্যবসা ছেড়ে বকরীর মাংসের দোকান দিয়েছিলেন তখন থেকে ও মাংস খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল। বকরীর মুণ্ডগুলোর খোলা চোখগুলো ওর মনে কেমন যেন একটা ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছিল—তার সঙ্গে একটা দুঃখ ও হয়েছিল তার। মাছ মাংস রেঁধে দিতে ওর আপত্তি ছিল না কিন্তু কাটা বকরী দেখতে ওর আদৌ ভাল লাগত না। আজকাল ও যাহোক করে রান্না করতে শিখেছে।

বাপজান খুব ভোরে উঠে মুখ ধুয়ে সকালের নামাজ পড়ার পর কুঞ্জুপাতুম্মা এক কাপ দুধ-ছাড়া চা তৈরী করে দেয়। বাপজান চা খেয়ে তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, হাতে দুটো টাকা। দূরের কোনও বাজার থেকে কলা, কচু, সুপুরি, নারকেল কিনে বিক্রি করবেন।

'চেম্মীনটীমা কি রত্নখনির সন্ধানে গেল রে'—বলতে বলতে আম্মা

ঘুম থেকে উঠবেন। তখন কাক-ডাকা ভোর শেষ হয়ে চারদিকে সোনা ছড়ানো রোদ্দুর উঠেছে। আম্মার এখন আল্লাহের সঙ্গে ঝগড়া তাই নামাজ আর পড়েন না।

আপন মনেই বলেন—ওঃ, অনেক নামাজ পড়েছি, খোদাকে অনেক ডেকেছি, তাইতেই এই অবস্থা। তারপরই তাকে হাঁক পাড়ে: 'এই হারামজাদী, জল গরম করেছিস?'

জল গরম করে রাখা হয়েছে। কুঞ্জুপাতুম্মা বলে:

'জল গরম করে রেখেছি আম্মা।'

গরম জল না হলে আম্মা স্নান করেন না। তাই রোজ কুঞ্জুপাতুম্মা জল গরম করে রাখে। কিন্তু তাতেও আম্মা খুঁত ধরবেন। হয় গরম বেশী হয়ে গেছে, নয় কম। স্নান করে উঠে আম্মার পরিষ্কার ধোওয়া কাপড় চাই। বেশী করে দুধ আর চিনি দিয়ে বেশ কড়া চা আর ঘিয়ে জবজবে পরোটাও চাই। যা কাপড়-চোপড় ওদের আছে সেগুলো কুঞ্জুপাতুম্মা রোজ কাচে। স্নান করা হলে আম্মার কাপড় আম্মাকে দেয়। তারপর তালের গুড় মিশিয়ে দুধ ছাড়া চা ও খায়। চায়েতে মিষ্টির বদলে নুন দিয়ে খেলে কেমন লাগে তাও কুঞ্জুপাতুম্মা আবিষ্কার করেছে। দুধ ছাড়া চা খেতে আম্মার একটুও ভালো লাগে না, কিন্তু কি করবে আর কোন উপায় না দেখে খেতে হয়— আম্মা চায়ে চুমুক দেন আর বলেন—'হারামজাদী তোর জন্যেই আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা।' আগে আগে আম্মা রাগ হলে পর মাটির থালা বাসন সব ভেঙ্গে চুরমার করতেন। কিন্তু রোজ মাটির বাসন কিনতে পয়সা লাগে না? তাই বাপজান একদিন বললেন:

'এখন থেকে ওকে নারকেল মালায় খেতে দিলেই হবে।'

আম্মা তাই শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

'হায় খোদাতালা, হায় ময়দীন[১] শুনতে পাচ্ছ, হে পয়গম্বর শুনতে পাচ্ছ? আনামকারের সোনার মেয়ের জন্য নারকেল মালা যথেষ্ট।'

এর জন্যে কুঞ্জুপাতুম্মাকে গাল খেতে হল।

---

[১] ময়দীন মহিউদ্দীন একজন মুসলমান সাধুর নাম।

'তুই হতচ্ছাড়ী অলপ্পেয়ে মেয়ে। সব তোর ভাগ্যের দোষ। তোর ওই তিলটার দোষ।'

আচ্ছা ওর গালের কালো তিলটাকে ও খুঁটে তুলে ফেলে কী করে?

এসব শুনলে বাপজানের চোখ লাল হয়ে ওঠে। বাপজান আস্তে আস্তে 'এই কোচ্চুতাচুম্মা' বলে ডাকছে। এই ডাকের মধ্যে একটা কঠোরতা আর ভয়াবহতার সুর অনুভব করে আম্মা চুপ করে যান। বাপজান বাইরে গেলে পর আম্মা শুরু করেন:

'হারামজাদী তোকে গোখরো সাপে কাটে না কেন, তোর মরণ হয় না কেন। তোকে জন্ম দেওয়ার জন্যে......'

এইভাবে আম্মা চিৎকার করে চলবেন। রাস্তা দিয়ে ছোট ছেলেরা যাওয়ার সময় আম্মাকে ভেঙ্গাবে, কুঞ্জুপাতুম্মা বলে:

'আম্মা একটু আস্তে বল।'

'কেন? যত জোরে পারি চেঁচাব। আমার চিৎকার করার লাইস্‌ন আছে।'

এইভাবে একদিন আম্মা কি যেন চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করছিলেন। বাপজান শুনে আম্মাকে চুপ করতে বললেন। আম্মা বাপজানের কথায় কান দিলেন না। বাপজান আবার চুপ করতে বললেন, কিন্তু তবু আম্মা শুনলেন না দেখে বাপজান চোখ লাল করে আম্মার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তা দেখে আম্মা বাপজানকে টিটকারি দিয়ে হাসলেন। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন:

'ওহো হো, চেম্মীনটীমা আনামকারের মেয়েকে ভয় দেখাতে এসেছে রে —' আম্মার বলা শেষ হবার আগেই একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

বাপজান ছুটে গিয়ে আম্মার গলা চেপে ধরে খুব জোরে টিপতে লাগলেন। আম্মার চোখ বেরিয়ে এল।

দাঁত কিড়মিড় করে বাপজান আস্তে আস্তে বললেন—'তুই মর।'

ঠিক একটা ছোট্ট ছেলের মত আম্মাকে এক হাতে বাপজান ঘাড় ধরে ওপরে তুলে তারপর ধপ করে ফেলে দিলেন। আম্মার খড়ম-ছুটো লাথি মেরে বাইরে ফেলে দিলেন। আম্মা অনড় হয়ে পড়ে রইলেন।

এতখানি ব্যাপার সব চোখের পলকে ঘটে গেল। কুঞ্জুপাতুম্মা যা আশঙ্কা করেছিল তাই হল! কুঞ্জুপাতুম্মা চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। ওর মনে হল ও যেন এক গভীর অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। বাপজান আম্মাকে মেরে ফেলেছেন। ওর জিভ যেন মুখের মধ্যে আটকে গেল। ও নিঃশব্দে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। বাপজান তখন বললেন:

'কুঞ্জুপাতুম্মা, খুকী কাঁদিস না।'

বাপজানের এই সান্ত্বনা বাক্য শুনে ওর ছু চোখে যেন রাজ্যের কান্না এসে জড় হল। বুকখানা ভেঙ্গে যেন ওর কান্না এল। ছুচোখ বেয়ে দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। হায় খোদাতালা! এখন কি যে হবে কে জানে। একটার পর একটা বিপদ। সাহায্য করার কেউ নেই। আম্মা মরে গেল······বাপজানকে এক্ষুনি পুলিস হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে।

কুঞ্জুপাতুম্মার তখন আপনার বলতে কেউ থাকবে না। এক্ষুনি লোকজন এসে আম্মার দেহকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে কাফন দিয়ে ঢেকে "লাইলাহ্ ইল্লালাহ্" বলে নিয়ে গিয়ে মসজিদের কবরখানায় কবর দেবে। তারপর······কুঞ্জুপাতুম্মা আর কিছু ভাবতে পারল না। ও হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

'বাপজান কেন তুমি এমন করলে?'

'সোনা মেয়ে কাঁদিস নে। যা ওই দাওয়ায় গিয়ে বোস।'

কুঞ্জুপাতুম্মা দাওয়ায় গিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদল। ও কোনও দিকে সমস্যার কোনও সমাধান খুঁজে পেল না। কাঁদতে কাঁদতে ওর হঠাৎ "সজ্রুতল মুনতাহার" কথা মনে পড়ল।

"সজ্রুতল মুনতাহা" স্বর্গের একটি বনস্পতির নাম। এর কাহিনী একদিন মসজিদে ধর্মালোচনায় ও শুনেছে। ওই গাছের পাতায় পাতায় পৃথিবীর সব জীবজন্তুর নাম লেখা আছে। হাওয়া লেগে কখনও কখনও ওই পাতাগুলোর দু-একটা খসে পড়ে। সেই সব পাতায় যাদের নাম লেখা আছে, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে তারাও মারা যায়। কোনও কোনও পাতা অনেক দিন ধরে একটু একটু করে শুকনো হয়ে একদিন ঝরে পড়ে। কোনও কোনও পাতা সবুজ থাকতে থাকতে খসে পড়ে, আবার কোনও কোনও পাতা গজাতে না গজাতে ঝরে পড়ে। আম্মার নাম লেখা পাতা···এই যেই ভাবতে শুরু করেছে, অমনি ঘরের মধ্যে থেকেও আম্মার গলার আওয়াজ পেল।

'আল্লাহ্ আমার কেউ নেই, পয়গম্বর, আমার কেউ নেই।'

কুঞ্জুপাতুম্মার সব মনোবেদনার অবসান হল! ও মনে মনে ভাবল হাওয়া বইল কিন্তু পাতা পড়ল না।

তারপর ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে দেখে আম্মা উঠে বসেছেন। ওকে দেখা মাত্র আম্মা বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

'আম্মা চুপ কর, অমন করে কেঁদ না'—বলে ও আম্মার কাছে এল।

আম্মা তখন সুর করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

'টিপে দে রে, টিপে দে—হে পীর, হে পয়গম্বর আমি গেলাম। টিপে দে রে, টিপে দে।'

কোথায় টিপে দিতে হবে কুঞ্জুপাতুম্মা বুঝতে পারল না। ও বলল ঃ

'কোথায় টিপে দেব আম্মা ?'

আম্মা টেনে টেনে বললেন ঃ 'ঘাড়ে, হাতে পায়ে।'

'তুই সর, কুঞ্জুপাতুম্মা, বাইরে গিয়ে বোস' বলে বাপজান আম্মার গা হাত পা টিপতে লাগলেন।

কুঞ্জুপাতুম্মা বারান্দায় গিয়ে বসল। বাইরে থেকে আম্মা

বাপজানের গলার আওয়াজ পাচ্ছিল। এর মাঝে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন—

'আমায় মেরে ফেলে আর একটা বিয়ে করার মতলব—না ?'

তাতে বাপজান কি যেন বললেন, কুঞ্জুপাতুম্মা মন দিল না। ও উঠোনে নেমে এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগল। তারপর শুনতে পেল বাপজান বলছেন যে, আমাদের "তওবা" করতে হবে। অর্থাৎ যে দোষ করা হয়েছে তার জন্যে আল্লাহের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে—ভবিষ্যতে যেন এমন অপরাধ আর না হয়। এটা তো ভালো কথা কিন্তু ওদের বাড়িতে "তওবা" করার বই নেই। প্রায় সব মুসলমান বাড়িতেই "তওবা" করার বই আছে। তওবা আরবীতে লেখা। তারপর মোল্লারা আরবী, মালয়ালমে ছাপিয়ে বের করেছে। বাপজান কারুর বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে আসবেন। এইসব ভাবতে ভাবতে কুঞ্জুপাতুম্মা পায়চারি করছিল, তখন দেখল যে বাপজান আর আম্মা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এলেন। আম্মা বললেন ঃ

'তেল, মালিশ আর গা ঘষার খোসা চাই।'

বাপজান 'হুঁ' বলে কুঞ্জুপাতুম্মাকে বললেন ঃ

'কুঞ্জুপাতুম্মা, আম্মার স্নান করার জন্য কুয়ো থেকে একটু জল তুলে গরম কর।' বলে বাপজান বাইরে চলে গেলেন !

কুঞ্জুপাতুম্মা কুয়ো থেকে জল তুলে গরম করছে এমন সময় বাপজান তেল, মালিস, খোসা সব নিয়ে এলেন।

আম্মা তেল মেখে স্নান করার উদ্যোগ শুরু করলে পর বাপজান বাইরে গেলেন। কুঞ্জুপাতুম্মা বলল ঃ

'আম্মা চান কর গিয়ে।'

আম্মা বললেন, 'যাই'।

এর পর কুঞ্জুপাতুম্মা তোয়ালে কাপড় দড়ি বালতি নিয়ে পাশের আঙ্গিনায় পা বাড়াল। ওর সেই পা বাড়ান যে ওর জীবনের পাতায় এক নতুন অধ্যায় খুলতে চলেছে তা ও জানতে পারল না। আম্মা বললেন ঃ

'বেশী দেরি করিস না।'

ও বলল : না আমি এক্ষুনি আসছি।'

কুঞ্জুপাতুম্মা যেতে যেতে ভাবল, হাওয়া তো বইল কিন্তু পাতা যদি পড়ত তা হলে ?

ও মনে মনে প্রার্থনা করল—

'খোদাতালা—হাওয়া বইলেও আমাদের নাম লেখা পাতা যেন খসে না পড়ে।'

একটি চড়াই পাখির কান্না

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—

কুঞ্জুপাতুম্মা উঠোনে পা দিয়েই চড়াই পাখির কিচিরমিচির শুনতে পেল। একটু দূরে গিয়ে দেখে দুটো চড়াই পাখি তাদের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরি করছে। ওদের মধ্যে একটা পাখি করুণ স্বুরে কেঁদে চলেছে।

পাখি দুটো এমনভাবে নিজেদের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরি শুরু করেছে কেন? ও "হুস্ হুস্", "যাঃ যাঃ" করে পাখি দুটোকে তাড়া দেওয়ায় উড়ে পালাল।

ওদের বাড়ির আর পাশের অঙ্গিনার মধ্যে বেশ বড় একটা খানা মত। পাশের আঙ্গিনায় যেতে হলে এই খানা পার হয়ে যেতে হয়। খানার ওপর একটা নারকেলের গুঁড়ি দিয়ে সাঁকো মত করা হয়েছে। সাঁকো পার হয়ে কুঞ্জুপাতুম্মা দেখল যে পাখি দুটো তেঁতুল গাছের ওপর বসে আবার দুজনের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরি শুরু করেছে। ওদের মধ্যে একটা পাখি কাঁদছে। চিলে ছোঁ মেরে মুরগীর বাচ্চা নিয়ে পালানোর সময় বাচ্চাটা যেমন চিঁচিঁ করে কাঁদতে আর ডাকতে থাকে তেমনি ভাবে এই পাখিটাও যেন কেঁদে কেঁদে তার সাহায্য চাইছে। কুঞ্জুপাতুম্মার পাখিটার জন্যে খুব কষ্ট হল। ও দড়ি বালতি নামিয়ে রেখে পাখি দুটোর কাছে দৌড়ে গেল।

'এই, কেন তোরা এমন করে ঝগড়া করছিস? থামা তোদের ঝগড়া।' ও বেশ ভদ্রভাবেই বলল। কিন্তু পাখি দুটো তার কথায় কান দিল না। ভীষণ রাগে একটা আর একটাকে ঠুকরে চলেছে। বাবাঃ, ছোট পাখি হলে কি হবে, কি রকম রাগ আর ঠোকরানি। স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ান পাখির ঝগড়া এই প্রথম কুঞ্জুপাতুম্মা

দেখল। মুরগীরা যখন নিজেদের মধ্যে ঠোকরা-ঠুকরি শুরু করে তখন তাদের একজনকে সরিয়ে দিতে হয়। এ-রকম ভাবে ছাড়িয়ে না দিলে একজন আর একজনকে ঠুকরে মেরে ফেলে। কুঞ্জুপাতুম্মা তাই আবার বলল ঃ

'কথা শোনা হচ্ছে না, না ?'

একটা কাঠঠোকরা পাখি কর্কশ গলায় কটকট করে উঠল অর্থাৎ 'পাখিদের ব্যাপারে পাখিরা মাথা ঘামাবে—তুমি সর্দারী করার কে হে বাপু'—বলে উড়ে গিয়ে একটা নারকেল গাছের ওপর বসে ঠোঁট দিয়ে ঠকাঠক ঠকাঠক ঠুকতে লাগল। চড়াই পাখি ছুটো তেঁতুল গাছ থেকে উড়ে গিয়ে আর একটা গাছে বসল কিন্তু সেখানে গিয়েও তাদের ঝগড়া থামল না। শেষে যে পাখিটা বেশী ঠোকরানি খাচ্ছিল সেটা করুণ স্বরে আর্তনাদ করে শুকনো পাতা ভর্তি একটা গভীর খানার মধ্যে পড়ে গেল। মানুষ যেমন ছুই হাত প্রসারিত করে ভূমিকে আলিঙ্গন করে পড়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে পাখিটা ছুটো পাখা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কুঞ্জুপাতুম্মা পাখিটার জন্যে সত্যি ব্যথা অনুভব করল। ও অন্য পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখ্ তো তুই কী করলি।' তারপর খানাটার পাশে গিয়ে দেখতে লাগল পাখিটাকে তোলা যায় কিনা। খানাটার কাছে গিয়ে দেখে নীচে নামার কোনও উপায় নেই। আহা, পাখিটা কি মরে গেল ? ওর মুখে যদি এক ফোঁটা জল দেওয়া যায় তাহলে পাখিটা এক্ষুনি বেঁচে ওঠে। না কি ওর নাম লেখা 'সজ্রুতল মুনতাহার' পাতা খসে পড়েছে ? ওঃ, গাছটা যে কতবড় তা ভাবা যায় না, ওতে কত পাতা আছে কে জানে। সব পাতাগুলো একরকম নয়। পিঁপড়ের নাম লেখা যে পাতাগুলো সেগুলো নিশ্চয়ই খুব ছোট ছোট। চড়াই পাখির নাম লেখা পাতাগুলো আর একটু বড়। হাতির নাম লেখা পাতাগুলো আরও অনেক বড়। ওর নানার সেই বড় হাতির নাম লেখা পাতাটা হয়তো এতদিনে 'সজ্রুতল মুনতাহার নীচে শুকিয়ে পড়ে আছে। হয়তো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে স্বর্গের

মাটিতেই মিশে গেছে। স্বর্গে মাটি আছে কিনা কুঞ্জুপাতুম্মা জানে না। ওখানটার এক পাশে কতকগুলো বুনো লতা ধরে আস্তে আস্তে নীচে নামতে চেষ্টা করল। ওর পা লেগে শুকনো মাটি ঝুরঝুর করে খসে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জুপাতুম্মা 'আল্লাহ্' বলে চিৎকার করে পড়ে গেল।

ওর সমস্ত দেহে আঘাত লাগার ফলে কোথাও ছড়ে আঁচড়ে কেটে গেল। ও দেখতে পেল যে ওর বাঁ হাতের কনুইয়ের নীচে অনেকটা কেটে গেছে আর রক্ত পড়ছে। খানার মধ্যে ওর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, সারা দেহ গরম হয়ে উঠেছে, হাত পা সব জ্বালা করছে কিন্তু সে সব কিছু লক্ষ্য না করে ও চড়াই পাখিটাকে তুলে ধরল। পাখিটাকে একটু জল দিতে পারলে ভালো হত। হাত দিয়ে যে রক্ত পড়ছে আগে তা ও দেখে নি। এখন রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে দেখে ও পাখিটাকে বলল, 'দেখ্ তো তোর জন্যে আমার হাতটা কেটে গেল।' তারপর ও পাখিটার ঠোঁট দুটো আস্তে আস্তে খুলে ডান হাত দিয়ে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে পাখিটার মুখে দিল। তারপর ওর পাখা দুটো ঠিক করে টানটান করে দিল। একটু পরে পাখিটাকে উল্টে ওর পেট দেখে বেশ দরদ আর সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠল—'ওঃ আম্মা, এটা যে মেয়ে চড়াই পাখি।' লাল চালের ভাতের ফেনের মত লালচে পাখিটার পেটের চামড়া। আর পালকের নীচে পেটের মধ্যে দুটো ছোট ছোট ডিম ও স্পষ্ট দেখতে পেল। ঠিক বাপজান যেমন আম্মার গলা টিপে মারতে গিয়েছিল ঠিক সেইরকম। ছিঃ ছিঃ। ও অন্য পাখিটাকে জিজ্ঞেস করল—

'এই, তুই তোর বউকে কেন মেরে ফেলতে গিয়েছিলি রে?'

মেয়ে চড়াই পাখিটা তখনও পর্যন্ত মরে নি। পাখিটার খোলা চোখদুটোর মধ্যে দিয়ে জীবনের ইঙ্গিত ও দেখতে পেল। এখন কি করে খানার ওপর উঠবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে কুঞ্জুপাতুম্মা মাটি থেকে উঠল। তখন ওপরে খানার এক ধারে একটা জোয়ান ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ও দেখে নি। ওপরে ওঠার কোনও পথ না দেখতে

পেয়ে কুঞ্জুপাতুম্মা বড় ভয় পেয়ে গেল। এই খানার মধ্যে দিয়ে পোয়াটাক মাইল হেঁটে গেলেই ধানের ক্ষেত। কিন্তু ওই রকম ভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না, কারণ তাকে সদর রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। কী করা যায় এখন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ও একজনের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। ও ভয় পেল না, কিন্তু কি রকম এক অস্বস্তিতে ওর কান দুটো লাল হয়ে উঠল। অবশ্য নিজের কান সে দেখবে কেমন করে। কিন্তু ও বুঝতে পারছিল কান দুটো কেমন গরম হয়ে উঠেছে। আর দেখতে দেখতে অস্বস্তিটা যেন ছড়িয়ে পড়ল সর্ব অঙ্গে। একটি অপরিচিত ছেলে খানার ওপর থেকে জিজ্ঞেস করছে:

'পাখিটা বেঁচে আছে?'

ও কিছু বলল না। ও যেন শুনতে পায় নি এমন ভাব করল। অপরিচিত একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক নয়। ও মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। মাটিতে শুকনো পাতার ওপর ওর রক্ত পড়ে জমে গেছে আর তার চারপাশে অজস্র পিঁপড়ে ভিড় করেছে।

'তুমি বুঝি ওপরে উঠতে পারছ না?' আবার ওপর থেকে আওয়াজ এল।

সত্যিই ওপরে ওঠা মুশকিল—কিন্তু কী বলা যায়। যা-হোক ও সত্যি কথাই বলল—

'হাঁ, ওঠা মুশকিল।'

'মুশকিল?'

'হ্যাঁ।' কিন্তু এমনভাবে বলাটা কি ঠিক হল? লোকে জানতে পারলে কী বলবে? বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া মেয়ে একটা না-দেখা না-শোনা জোয়ান ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেছে। ভাবতেই কুঞ্জুপাতুম্মার কেমন লাগল। অমনি ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ও দেখতে পেল খানার একপাশের কতকগুলো শুকনো মাটি খসে পড়ছে। এই রে, ছেলেটা নেমে আসছে যে। সাদা

শার্ট আর সাদা ধুতি পরা। বাঁ হাতের কবজিতে সোনার ঘড়ি, চুল বেশ ফ্যাশান করে ছাঁটা।

কুঞ্জুপাতুম্মা এতটুকু মাত্র দেখতে পেল। আল্লাহ্, ও যেমন ভাবে পড়ে গিয়েছিল তেমনি ভাবে এই ছেলেটা যেন পড়ে না যায় দেখো। ভাবতে ভাবতে শঙ্কিত দ্বিধাবিভক্ত মনে ও ওখানে দাঁড়িয়ে রইল।

'আজ পর্যন্ত তোমার মত মেয়ে আমি একটিও দেখি নি। চড়াই পাখিকে বাঁচাবার জন্যে এত আগ্রহ? পাখির নাম কি? হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। পাতলা গোঁফের রেখা, হাসিমাখা চোখ মুখ, কুঞ্জুপাতুম্মার মত অত ফরসা নয়। ওর নাম জিজ্ঞেস করেছে ভেবে কুঞ্জুপাতুম্মা বলল—

'কুঞ্জুপাতুম্মা।'

'ওহো, কুঞ্জুপাতুম্মা?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ বাঃ বেশ নাম।' তারপর ছেলেটা বলল: 'কুঞ্জুপাতুম্মা তোমার রক্ত বুঝি পাতায় ঝরে পড়েছে?'

'হ্যাঁ'—বলার সঙ্গে সঙ্গে কনুইয়ের নীচে ও একটা ব্যাথা অনুভব করল। হাত উল্টে দেখে যে আবার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে।

'আহা, হা-হা' ছেলেটা বলে উঠল—'হাতটা ওপরে তুলে ধর তা হলে রক্ত বেশী পড়বে না।'

তারপর ছেলেটা শার্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে ছিঁড়ে লম্বা তিনটুকরো করে তিনটিতে গিঁট বাঁধল। তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে তার থেকে একটা সিগারেট নিল। সিগারেটের কাগজ খুলে তামাক পাতা সব বার করল।

'হাতটা একটু নীচে নামাও।' কুঞ্জুপাতুম্মা হাত অল্প নীচে নামাল। ছেলেটা ওর ক্ষতে তামাক পাতা নিয়ে ঘষে দিল। ওর দেহ ওই ছেলেটার দেহ স্পর্শ করতে পারে এই ভয়ে ও পিছনে সরে একটু হেলে দাঁড়াল। ঠিক তখুনি ও দেখতে পেল যে ছেলেটার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলটা নেই, ঠিক যেন কেটে ফেলেছে। দেখে ওর

ভারি কষ্ট হল। আহা কি ভাবে আঙ্গুলটা কেটে গেল। কিন্তু ও কিছু জিজ্ঞেস করল না। ছেলেটা জিজ্ঞেস করল:

'জ্বালা করছে?'

'না।'

'একটুও না?'

'একটু, একটু।'

'ও কিছু নয়। তবে দেখো হাতে যেন পানি না লাগে। দু-তিনদিনের মধ্যে কাটা শুকিয়ে যাবে'—বলে ছেলেটা রুমালের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ওর কাটা জায়গাটা বাঁধল। তারপর সিগারেট বার করে ধরিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল—

'কুঞ্জুপাতুম্মা তুমি এখন ওপরে উঠবে কি করে?'

কুঞ্জুপাতুম্মা ওপরে ওঠার কোনও রাস্তা দেখতে পেল না কিন্তু তার জন্যে ও ঘাবড়াল না। ও কেমন যেন একটা নিশ্চিন্ততা বোধ করছিল। খুব ঠাণ্ডাতে আগুনের কাছে বসলে যেমন ভালো লাগে সেই রকম একটা অনুভূতি বা এরকম একটা কিছু, যা ও ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারে না।

'আচ্ছা, পাখিটাকে দেখি।'

কুঞ্জুপাতুম্মা হাত খুলল। সঙ্গে সঙ্গে চড়াই পাখিটা কিচির-মিচির শব্দ করে ওর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উড়ে গেল।

'কুঞ্জুপাতুম্মা তুমি উড়তে পার?'

'না।'

'তাহলে আমরা ডানা তৈরি করি এস।' এই বলে ছেলেটা কুঞ্জুপাতুম্মার ডান হাত ধরে খানার ধার দিয়ে ওপরে উঠতে সাহায্য করতে লাগল। মাঝে মাঝে 'ভয় পেয়ো না, উঠে এস' বলতে লাগল। একটুও কষ্ট না পেয়ে এত সহজে কি করে ওপরে উঠতে পারল তা কুঞ্জুপাতুম্মা বুঝতে পারল না। সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার। ওরা ওপরে উঠলে পর ছেলেটা হেসে—'আচ্ছা কুঞ্জুপাতুম্মা তুমি এবার যাও' বলে একদিকে চলে গেল।

কুঞ্জুপাতুম্মা ফিরতে লাগল যেন স্বপ্নের ঘোরে। ওর দেহের প্রতিটি অণুপরাণু যেন কি এক সুখে রোমাঞ্চিত হতে লাগল।

ও দড়ি বালতি কাপড়-চোপড় নিয়ে পাশের বাড়ির কুয়োতে স্নান করতে গেল। স্নান করার আগে ও অনেকগুলো বেলফুল একটা কলাপাতায় জড় করল। তারপর কুপ্পায়ম খুলে তোয়ালেতে গা ঢেকে মুণ্টু খুলল। চুল খুলে, দড়ি বালতি কুয়োয় নামাল। বালতি যেই পানিতে ঠেকেছে অমনি ওর ছেলেটার কথাগুলো—'হাতে যেন পানি লাগে না' মনে পড়ল। আর কি আশ্চর্য কাণ্ড! ঠিক ওই সময়েই ও আগের সেই ছেলেটাকে সেই বাড়ির দরজা খুলে বাইরে আসতে দেখল। ও থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি দড়ি বালতি জলে ফেলে দিয়ে কাপড় জামা টেনে নিল। তারপর গা ঢেকে লজ্জায় জড়সড় হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

'ও কুঞ্জুপাতুম্মা, তুমি স্নান করছিলে বুঝি?' ছেলেটা বলল: 'আমি বুঝতে পারি নি। আমার একটু পানির দরকার ছিল। আমি এক গ্লাস পানি নিয়ে চলে যাব।'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল—'কুয়োর মধ্যে দড়ি বালতি পড়ে গেছে।'

'কি হয়েছে দড়ি বালতির?'

'কুয়োয় পড়ে গেছে।'

তখন ছেলেটা হেসে কুয়োতে উঁকি দিল।

'তুমি এখন স্নান করবে কি করে?'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না। দড়ি বালতি না নিয়ে বাড়ি গেলে আম্মা আস্ত রাখবেন না। ছেলেটা তখন আস্তে আস্তে কুয়োর সিঁড়ি দিয়ে নেমে দড়ি বালতি তুলে নিয়ে এল। তারপর একটা ঘটি করে পানি নিয়ে যাবার সময় বলে গেল—

'কুঞ্জুপাতুম্মা তুমি স্নান করে নাও। কাটা জায়গাটা ভিজিও না।'

ছেলেটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কুঞ্জুপাতুম্মা আর স্নান করল না। ও কুপ্পায়ম আর মুণ্টু পরে দড়ি বালতি নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ি গিয়ে

কুয়োর জল তুলে স্নান করল। স্নান করতে করতে ওর ওই ছেলেটার কথা মনে হতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা লজ্জা আর আনন্দে ওর চোখমুখ আশ্চর্যভাবে যেন আপনাআপনি লাল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু ও কে? ওই বাড়িটায় কি করে এল?

সে রাত্রে ও ভাত খেল না। ভাত খাবে না কেন আম্মা জিজ্ঞেস করতে বলল: 'এমনিই'। বাপজান জিজ্ঞেস করলে বলল: 'আমার বুকের ভিতর ব্যথা করছে।'

সেদিন রাতে "তওবা"র সময় কুঞ্জুপাতুম্মা সেই ছেলেটার কথাই ভাবছিল। রাত তখন অনেক গভীর হয়েছে। ওদিকে ডিবের আলোয় বই দেখে বাপজান তখন "তওবা" পড়ছিলেন, আম্মা ভক্তির সঙ্গে তা আওড়াচ্ছিলেন, সেও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের মত তা আওড়াতে যাচ্ছিল। এক-একটা কথা তিন তিনবার করে ওরা বলছিল। বাপজান আরম্ভ করলেন—

'আল্লাহ্, আমরা সবাই তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের সব ছোটখাট দোষত্রুটি, বড় বড় অপরাধ, জানা অজানা সব দোষের জন্য তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ভবিষ্যতে আর আমরা দোষ করব না। ইবলীসের থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমাদের সকলকে ফিরদৌস নামে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে তোমার মহিমা দেখাও। তোমার নিকাহ্ দেখার জন্য এবং তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য তুমি আমাদের সাহায্য কর'—তারপর "আমেন" বলে বাপজান "তওবা" শেষ করলেন।

এরপর আম্মা কিছুদিন বেশ চুপচাপ ছিলেন। বেশী গোলমাল করেন নি। এমন কি আম্মা কুঞ্জুপাতুম্মাকে কখনও কখনও 'আমার কত কষ্টের ধন' বলে আদর করলেন, কিন্তু বেশীদিন এই-ভাব রইল না। আম্মা আবার গণ্ডগোল শুরু করলেন। ঝগড়া, গালাগালি আরম্ভ হল। বাপজানের ওপর আম্মার রাগ, তাই বাপজানকে রাগাবার জন্যে আম্মা যত বকুনি দিতেন কুঞ্জুপাতুম্মাকে। যদি ও তাতে কিছু বলত তো আম্মা বলে উঠতেন—

'হতচ্ছাড়ী! সেই জন্যেই তো তোকে কেউ বিয়ে করতে আসছে না। তুই ঘরে বসে বসে ছাতা ধরে গেলি। তোর কপাল খারাপ। আমার বিয়ে হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে। তোর এখন বাইশ বছর, বাইশ।'

বাপজান বলেন, 'তুমি একটু মুখ বন্ধ করবে? আল্লাহ্ চাইলে ওর বিয়ে এই বছরেই হয়ে যাবে। আমি ছেলে দেখছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ওর বিয়ে আর হয়েছে! কে করবে ওকে বিয়ে?'

আম্মার ধারণা ওকে বিয়ে করতে কেউ আসবে না। হয়তো মনে মনে ইচ্ছেটাও তাই।

'কী দেখে আসবে?' আম্মা বলেন।

সত্যি কিছুই নেই তাদের। যৌতুক দেওয়ার পয়সা নেই, গায়ে একদানা সোনা নেই।

বাপজান বলেন: 'কেউ না কেউ আসবেই।'

কে আসবে? কুঞ্জুপাতুম্মারও মনে মনে সেই চিন্তা; মধ্যে মধ্যে মনে জ্বালা ধরে। সে ভাবে, যে কেউ আসুক ওর তাতে কিছু এসে যায় না, কেউ এলেই হল। ঘরে ওর একটুও সুখ নেই। সব সময় আম্মার বকুনি আর গালাগালি। সব-তাতে আম্মার রাগ আর লম্ফঝম্ফ! গ্রামে যা ঘটবে তা সব আম্মার জানা চাই। সব কিছু ব্যাপার নিয়ে আম্মার সঙ্গে আলোচনা করা চাই। কিন্তু কেউ আম্মাকে আমল দেয় না। আম্মা তাই সকলকে গালাগালি করবেন।

চলছিল এমনি ভাবে। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলে, ওই কুয়োর ধারের সেই খোলা জায়গাটা আর সেই বাড়িটা (যে বাড়িটা থেকে সেই ছেলেটি বেরিয়েছিল।) সেটা যেন কারা কিনে নিয়েছে! কিনে নিয়েছে? কেন? কারা? কী হবে তাদের? কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবলে আশ্চর্য মানুষের গরজ। আরও কয়েকদিন পর প্রশ্নের উত্তর পেলে সে। সেদিন তারা ওই বাড়িতে এল। কুঞ্জুপাতুম্মা শুনতে পেলে—যারা এসেছে নদীতে স্নান করার জন্য তারাই বাড়িটা কিনেছে। তিনজন লোক—সব কাফের। জেনে,

দুঃখে কুঞ্জুপাতুম্মার হৃদয় ভরে গেল। এক বয়স্ক ভদ্রলোক, বয়স্কা ভদ্রমহিলা আর বেশ ভারি চালবাজ একটা মেয়ে।

কুঞ্জুপাতুম্মা সারা হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করল। কেমন যেন অসহায়তা। সত্যিই ওর কপাল খারাপ। বেদনার্ত হৃদয়ে ও ডেকে ওঠে—

'আল্লাহ্!'

এই মাত্র। হতাশা এবং বেদনায় ভরা বুক নিয়ে এর বেশী ও কিছু বলতে পারে না।

তবু যেন দুঃখ হতাশার পিছনে বা তলায় আরও কী রয়েছে। হৃদয়ের এক গভীরে—সে কী?

ছেলেপিলেরা আম্মাকে হাসি ঠাট্টা করে। তাতে বাপজানকে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে। নইলে আম্মা সেই খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে খটখট খটখট শব্দ করে তাদের বাপনানার নাম ধরে গালাগালি দেবেন। আম্মার সব-তাতে লাইসেন্স আছে। মসজিদের ব্যাপারেও আম্মার মাথা গলানো চাই, কিন্তু এ ব্যাপারেও কেউ আম্মাকে গ্রাহ্য করে না। আম্মা তাই ঘরে বসে বসে সকলকে গাল দেন।

বাপজান বলেন: 'তুমি কি একদণ্ডও চুপ করে থাকতে পার না?

'চুপ না করলে চেম্মীনটীমা কি আমাকে কেটে ফেলবে নাকি?'

'এই'—বলে বাপজান যখন ভয়ঙ্কর গলায় গর্জন করে ওঠেন তখন কুঞ্জুপাতুম্মার মুখ ভয়ে শুকিয়ে যায়। আবার কী ঘটে কে জানে! ও আস্তে আস্তে ডাকে—

'বাপজান।'

বাপজান ওর দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। তারপর কিছু না বলে বাড়ির বাইরে চলে যান।

আম্মা আর বাপজানের মধ্যে আবার ঝগড়া শুরু হয়েছে। কেন এমন হয়? ও চুপচাপ বসে বসে ভাবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেটির কথা ওর মনে পড়ে যায়। আশ্চর্য! যেন এ দুয়ের মধ্যে একটা

কি সম্পর্ক আছে। কিন্তু আর তো তাকে দেখতে পায় না এখন। কোথায় চলে গেল? কোথা থেকেই বা এসেছিল? কিই বা নাম কে জানে। কিছুই ও জানে না। জীবনে একবার মাত্র এই রকম একজন ভদ্র ভালমানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। সেই মুখ। সেই মিষ্টি হাসি আর সেই কাটা, কড়ে আঙ্গুলটা। কী কারণে ও জানে না—কাটা আঙ্গুলটার কথা ওর সব সময় মনে পড়ে। তাকে মনে পড়লে সব যেন কেমন হয়ে যায়। মনে হয় বাড়িটা শূন্য, কুয়োর ধারে ফুলে ভর্তি বেলফুলের গাছগুলোও শূন্য আর জ্বলে যাওয়া রুক্ষ বিবর্ণ ঘাস তো শূন্যই বটে।

সেই দিনটির সুখস্মৃতি একটি মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠল ওর কাছে। মূল্যবান কিন্তু গোপনীয়।

বুদ্ধু মেয়ে

একদিন কুঞ্জুপাতুম্মা দেখতে পেল, ওদের প্রতিবেশী সেই চালবাজ মভ কাফের মেয়েটা পুকুরে স্নান করতে এসেছে।

মেয়েটা শাড়ি ব্লাউজ খুলে রেখেছে। গায়ে তখন শুধু কাঁচুলি আর সায়া। 'ওঃ বাবা, কুপ্পায়মের নীচে সিল্কের কুপ্পায়ম, মুণ্টুর নীচে আবার......' কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের মধ্যে কেমন করে উঠল। খোদাতালাহ্ ! ওই কাফের মেয়েটা দেখি স্নান করতে যাচ্ছে। জোঁক কেটে ওকে শেষ করে ফেলবে আজ।

কুঞ্জুপাতুম্মা পুকুরের দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে ওর চুল খুলে পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। তবুও ও ছুটতে লাগল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটার কাছে গিয়ে বলল, 'এই-জলে ছান করো না, ছান করো না।' কাফের মেয়েটা কোন রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে কুঞ্জুপাতুম্মাকে বলল ঃ

'বুদ্ধু মেয়ে, 'ছান' করো না, 'ছান' করো না নয়, স্নান করো না, স্নান করো না বলতে হয়।'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না। আহা 'ছান' করতে বারণ করলাম তো কথা কানে নিল না। মরুকগে জোঁকে রক্ত শুষে খাক। ওঃ স্নান করো না, স্নান করো না বলতে হবে কেন ? 'ছান' করো না বললে দোষ কী ? বাবা ঃ কি অহংকার মেয়েটার ! কাফের মেয়েরা সব এই রকম। তবে আগের স্মৃতি ওর মনে ছিল। আগে ছোট্টবেলায় ওর বাপজান ওকে সাজিয়ে গুজিয়ে যখন নদীতে চান করাতে নিয়ে যেতেন তখন স্কুলের সেই কাফের শিক্ষয়িত্রীরা তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। যদিও এই মেয়েটা ওদের মত

শাড়িপরা তবু এ ওদের চেয়ে অনেক অহংকারী। কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু না বলে শোলমাছ দেখার জন্য পুকুরে উঁকি দিল।

'বাঃ, কি সুন্দর চুল!' সেই চালিয়াৎ মেয়েটা বলছে শুনতে পেল। 'ও বাবা, আবার কালো সৌন্দর্য-তিল, তুমি তো বেশ সুন্দরী গো' —বলে সেই মেয়েটা শাড়ি ব্লাউজ পরে কুঞ্জুপাতুম্মার কাছে এল। তারপর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল ঃ

'সুন্দরী, এই পুকুরে স্নান করার জন্য জনসাধারণের ওপর কি কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বললে, 'আমার নাম ছোন্দরী নয়।'

'ছোন্দরী!' চালিয়াৎ মেয়েটা হাসল। বোকা মেয়ে—ছোন্দরী নয়, সুন্দরী; সুন্দরী বলতে হয়। থাক গে—নামটা কি তোমার?'

'কুঞ্জুপাতুম্মা'

'বাঃ বাঃ, বেশ নাম। হ্যাঁ, এই পুকুরে স্নান করলে কি হয়?'

'জোঁকে কাটবে।'

'মেয়ে জোঁক না ছেলে জোঁক?'

'বর, বউ দুজনেই ছিল। একটা আমার অনেক রক্ত শুষে খেয়ে ফেলেছিল। তারপর সেই জোঁকটাকে আমি যেই পুকুরে ফেলে দিলাম অমনি একটা শোলমাছ সেটাকে খেয়ে ফেলল। এতে ঢোঁড়া সাপ, ছোট ছোট কচ্ছপও আছে।' তারপর ওকে কিভাবে জোঁকে কেটেছিল তা সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বর্ণনা করল। কিভাবে জোঁকটা ওর হাঁটুতে ঝুলছিল বলার সময় ওই মেয়েটা শিউরে উঠে চোখ বড় বড় করে বাচ্চা হাতির ডাকের মত 'বো' করে একটা শব্দ করে উঠল। তারপর বলল ঃ

'আমি হলে চিৎকার করে সমস্ত লোক জড় করতাম। শেষে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতাম।'

কুঞ্জুপাতুম্মা চিৎকারও করে নি, অজ্ঞান হয়ে পড়েও যায় নি। ওর মনে বেশ একটা গর্ব বোধ হল। ও তেঁতুল গাছের তলাটার কাছে একটা পাকা তেঁতুল-ছড়া পড়ে রয়েছে দেখতে পেল। সেটা কুড়িয়ে

নিয়ে খোলা ছাড়িয়ে একটু মুখে দিল। চালিয়াৎ মেয়েটা ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তেঁতুল খাচ্ছ বুঝি ?

'হ্যাঁ।' তেঁতুল কি সব মেয়েদের ভাল লাগে? কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবল, তারপর জিজ্ঞেস করল ঃ

'তোমার চাই ?'

'একটু চাখবার মত।' মেয়েটা বলল। কুঞ্জুপাতুম্মার কিন্তু মনে হল বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর জিভ জলে ভর্তি হয়ে গেছে। কুঞ্জুপাতুম্মা ওকে অনেকটা তেঁতুল দিল, মেয়েটা অতখানি তেঁতুল গিলে খেয়ে ফেলল। সাধারণ মেয়েরা যেমন চোখ নাক মুখ কুঁচকে রসিয়ে রসিয়ে তেঁতুল খায় এ মেয়েটা তেমন ভাবে খেল না। বীচি সুদ্ধ তেঁতুলটা কপ্ করে গিলে ফেলল। কুঞ্জুপাতুম্মা বেশ অবাক হয়ে বলল ঃ

'এই রে, গিলে ফেললে কেন ? গিলতে পারবে না।'

'কেন, গিললে কি হবে ?'

'পেটে গাছ গজাবে ?'

মেয়েটা বলল ঃ 'ও, আমার কিন্তু কিছুই হবে না। আমি কালো পাথর পর্যন্ত খেয়ে হজম করে দিতে পারি। লোকে বলে ওটা নাকি আমার বয়সের গুণ।'

কুঞ্জুপাতুম্মা ওকে আর একটু তেঁতুল দিয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ

'তোমার কত বয়স ?'

'সতের।'

কুঞ্জুপাতুম্মা বললঃ 'আমার আম্মা বলে আমার বয়স বাইশ বছর।'

'আর বাপজান কি বলেন ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না।

'কি বুদ্ধু, কিছু বলছ না কেন ?'

'তুমি আমাকে বুদ্ধু বলছ কেন ?'

'ও ঃ তোমায় বুদ্ধু বলছি কেন? কেন তা আমিই কি ছাই জানি। আমার ভাইজান যে আমাকে বুদ্ধু বলে ডাকে, তাই হয়ত।'

ভাইজান! কাফেররা কি ভাইজান বলে ডাকে নাকি ?

মেয়েটা বলল, 'আমার মনে হয় মেয়েদের আর একটা নাম 'বুদ্ধু'। আমার ভাইজান আমাকে লুটাপী বলেও ডাকে।'

'তোমার ভাইজানের নাম কি?'

'নিজার আহাম্মদ।'

'ওঃ নিজার আহাম্মদ······তোমার নাম?'

চালিয়াৎ মেয়েটা বলল, আয়েষা।'

'তোমরা কী, মানে কোন ধর্মের লোক?'

শাড়িপরা চালবাজ মেয়েটা বলল, 'মুসলমান।'

হে খোদাতালা! কুঞ্জুপাতুম্মা সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল—'মুসলমান? আমাদের মত?'

'না—আমরা হচ্ছি খাঁটি মুসলমান।'

খাঁটি মুসলমান! তাজ্জব ব্যাপার! তবে ওপর কান ফুটো করে মাকড়ি পরে নি কেন? কানের পাতায় শুধু ছুটো সোনার ফুল পরেছে। ব্লাউজ আর শাড়ি। আবার বলে খাঁটি মুসলমান! তবুও সে আবার জিজ্ঞসা বরলে—কী নাম বললে?

আয়েষা। যদি চাও, আয়েষা বিবি নয় তো আয়েষা বেগমও ডাকতে পার। কলেজে আমাকে আয়েষা বিবি বলে ডাকে। বাড়িতে আমার আম্মা আর বাপজান আয়েষা বলে ডাকেন। আর ভাইজান ডাকেন 'লুটাপী' নয়ত 'বুদ্ধু'।'

পয়গম্বরের বিবির নাম তো আয়েষা।

কুঞ্জুপাতুম্মা মনে মনে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু সংশয় গেল না। এ আবার কি রকম মুসলমান রে বাবা! ও জিজ্ঞাসা করল:

'ওই দাঁড়িগোঁফ কামানো মাথায় চুলওলা লোকটী—'

আয়েষা কথার মাঝ পথেই কথা কেড়ে নিয়ে বলল—এমন ভাবে বলল যেন ওর সঙ্গে মজা করছে; আমার বাপজান, আর ওই শাড়ি পরা স্ত্রীলোকটি আমার আম্মা।'

তারপর আয়েষা পাল্টা জিজ্ঞেস করল:

'ওই লম্বা দাঁড়িগোঁফওলা মাথা কামানো ভদ্রলোকটি বহিনজানের বাপজান নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'আর সকাল থেকে সন্ধে অবধি বকর বকর করছেন যে মহিলাটি তিনি কে ?'

'আমার আম্মা।'

আয়েষা বলল, 'তোমার আম্মা সব সময় এত চিৎকার করে কথা বলেন কেন ? তোমার আম্মার চিৎকারের জ্বালায় পাড়াপড়শীর যে দুচোখ এক করবার উপায় নেই। মুসলমান মেয়েদের এ রকম হওয়াটা কি ভালো ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল, কিছু বলতে পারলে না। কী বলবে ?

আয়েষা বলল ঃ বহিনজান তোমার আম্মা কেন আমাদের বাড়ির সামনে ওই খানাটায় পাইখানা বসেন ?'

'রাত্‌রিতে আমরা রাস্তায় বসি কিন্তু দিনের বেলায় তো তা সম্ভব নয়।'

'তা বেশ ! মানুষের চলাফেরা করার রাস্তায় পাইখানা করাটা ভালোই বটে ! এখানকার লোকেরা সকলেই কি রাস্তায় পায়খানা করে নাকি ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল, 'হ্যাঁ'।

'কেন বাড়িতে পায়খানা তৈরী করে নিলে কি হয় ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না।

আয়েষা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি রাত্‌রি বলছিলে কেন, রাত্‌রি নয় রাত্রি।'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল, 'রাত্‌রি।'

'না না ঃ অমন করে নয়।' তিরি নয় 'ত্রি' 'ত্রি' তয়ে রফলা ইকার 'ত্রি'। বল রা, তারপর 'ত্রি', রাত্রি।

'রাত্রি' বলে কুঞ্জুপাতুম্মা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাড়ি কোথায় ?'

'আমাদের বাড়ি ? আচ্ছা সত্যি কথাই বলা যাক। আমাদের নিজেদের কোন বাড়ি নেই। তবে শহরে একটা বাড়ি আছে—সেটা আমরা ইজারা নিয়েছি। বাড়ির সঙ্গে অনেক জায়গাও আছে। তাতে আমরা অনেক ফুলফলের গাছ করেছি। আম, জাম, পেয়ারা, জামরুল সব ফলের গাছ আর বেল, গোলাপ, জুঁই, মল্লিকা সব ফুলের গাছ।'

তারপর বাড়ির বর্ণনা—টালিছাওয়া একটা দোতলা বাড়ি। তাতে হলদে দেওয়াল ঘেরা, গেট নীল রঙের। বাড়ির প্রত্যেক ঘরে বিজলী বাতি, একটা রেডিও।

'সে আবার কী?' কুঞ্জুপাতুম্মা জিজ্ঞেস করল। বাকী সব ও বুঝতে পেরেছিল। টিপলে আলো বেরনো টর্চলাইট ও দেখেছে। কিন্তু রেডিও কী বুঝতে পারল না।

আয়েষা বলল: 'ওটা একটা বাক্সের মত। তার মধ্যে থাকে গান, নানারকম খবর ইত্যাদি শুনতে পাওয়া যায়।'

'মককা থেকে শোনা যায় ?'

'আরব, তুর্কী, আফগানিস্তান, রাশিয়া, আফ্রিকা, মাদ্রাজ, জার্মানী, আমেরিকা, সিঙ্গাপুর, দিল্লি, করাচী, লাহোর, মহীশূর, ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কলকাতা, কলম্বো—পৃথিবীর যে কোনও দেশ থেকে শোনা যাবে।'

কুঞ্জুপাতুম্মা এ সব কিছু বুঝতে পারল না। তবু তার মনে হল চালটা একটু যেন বেশী হয়ে যাচ্ছে। ও জিজ্ঞেস করল:

'তোমাদের বাড়িতে তেঁতুল গাছ আছে ?'

'না।'

ওহো তেঁতুল গাছই নেই। তাহলে আর কি আছে বাপু তোমাদের। তারপর ও জিজ্ঞেস করল:

'বুদ্ধু তোমাদের হাতি ছিল ?'

'না।'

কুঞ্জুপাতুম্মা তখন বেশ গর্বের সঙ্গে বলল: 'আমার নানার একটা হাতি ছিল—খুব বড় একটা দাঁতালো হাতি।'

আয়েষা বললেঃ ‘আমার নানার একটা গরুর গাড়ি ছিল। তাতে করে আমার নানা ভাড়ায় অন্য লোকের জিনিস পত্র বয়ে আনতেন। তারই আয় থেকে আমার নানা বাপজানকে এম. এ. পড়িয়েছিলেন। হ্যাঁ, বহিনজান তোমাদের সেই হাতি এখন কোথায় ?’

‘সেটা মরে গেছে—না না, বেহেস্তে গেছে’। হাতিটা মুসলমানের ছিল বলে মরে গেছে না বলে বেহেস্তে গেছে বলা উচিত। মুসল-মানের বেলায় ‘বেহেস্তে গেছে’ আর কাফেরের বেলায় ‘মরে গেছে’ বলতে হয়।

আয়েষা বললে ঃ ‘হাতিটা মরে গেছে ?’

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল ঃ ‘বেহেস্তে গেছে। হাতিটা চারটে কাফেরকে মেরেছিল।’

‘শুধু চারজন কাফেরকে ? মুসলমান ক-জনকে ?’

‘মুসলমান একজনকেও মারে নি। ওটা যে হাতির মত হাতি ছিল।’

আয়েষা হেসে বলল ঃ ‘তাই যদি হয় তাহলে ওই দাঁতালো হাতিটার তো বেহেস্তে হীরে, পান্না, মাণিক্য দিয়ে তৈরী চারটে বাড়ি পাওয়া উচিত।’

অর্থাৎ ইহলোকে পুণ্যকর্ম করলে পরলোকে সুখভোগ অনিবার্য। শাস্ত্রানুসারে কাফেরকে মারলে পুণ্যকর্ম করা হয়।

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল ঃ ‘আমাদের অনেক টাকাপয়সা ছিল।’

‘এখন নেই ?’

‘সব গেছে।’ এইটুকু মাত্র কুঞ্জুপাতুম্মার জানা আছে।

আয়েষা জিজ্ঞেস করল ঃ ‘তোমার বাপজান কি করেন ?’

‘জিনিস কিনে বিক্রি করেন ?’

‘কি জিনিস ?’

‘এই যা পান তাই।’

‘বাপজানের নাম কী ?’

‘ভট্টনটীমা।’

‘আম্মার ?’

‘কুঞ্জুপাতুম্মা।’

আয়েষা বলল : ‘আমার বাপজান কলেজের প্রফেসর। নাম জয়নুল আবেদীন। আম্মার নাম হাজরা বিবি। আর ভাইজানের নাম নিজার আহম্মদ। আমার ভাইজান একজন কবি। তার কবিতা সবই প্রকৃতিকে নিয়ে। গাছ, ফুল ফলের ওপরেই তার কবিতা।’ আয়েষার নিজার আহম্মদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার ছিল। তাই সে বলে চলল—

‘আমার ভাইজানের এই প্রকৃতির ওপর, এই মাটিতে উৎপন্ন সব জিনিসের ওপর গভীর ভালবাসা। আমার ভাইজান খুব ফিটফাট ঝকঝকে তকতকে আবার একটু খুঁতখুঁতেও।’

কুঞ্জুপাতুম্মার নিজার আহম্মদের বিষয়ে শুনতে মোটেই ভালো লাগছিল না। বিশেষত ওই নামগুলো—জয়নুল আবেদীন, নিজার আহম্মদ—ও কোনও দিনই এই সব নাম শোনে নি। মকার, অড়ীমা, অস্ত, কোচ্চুপারু, কুট্টি, কুট্টি আলী, বাভা, কুঞ্জালু মৈদীন, অভরান, বীরান, কুঞ্জুকোচ্চু, আদ্দীল এই সব নামই ও শুনেছে। কিন্তু নিজার আহম্মদ……মনে পড়লেই মনে হয় লাল-লাল কটকটে চোখ, দুপাশে মুচড়ে তুলে দেওয়া গোঁফ, বুকে ঘন কালো লোম, শক্ত চওড়া কাঁধ মিলিয়ে একটা ভয়াবহ মূর্তি। ও জিজ্ঞেস করল :

‘তুটাপীর ভাইজান কবে আসবে ?’

‘কাল বা পরশু। যখনই আসুক। তোমার আম্মাকে আগে থাকতে বলে দিও যে আমাদের বাড়ির সামনের খানাটায় যেন পায়খানা না বসেন। ভাইজান এলে ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে।’

বাবা! সেই ভয়ঙ্কর লোকটা।

আয়েষা জিজ্ঞাসা করলো : ‘বহিনজান তোমার বিয়ে হয়েছে ?’

“না—তোমার তুটাপী ?”

‘বুদ্ধু, তুটাপী নয় লুটাপী। না : আমারও হয় নি। বি. এ. পাশ করার পর বিয়ে হবে। তা সে আমার ভাইজানের বিয়ের পর।

তবে আমার ভাইজানের বিয়ের মেয়ে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। অমি বললুম না, তিনি হচ্ছেন ভয়ানক ফিটফাট আর খুঁতখুঁতে। শুধু মেয়ের দিক থেকে নয় বাড়িও বেশ পরিষ্কার ফিটফাট হওয়া চাই। একবার ভাইজান এক বি. এ. পাশ মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। পানির গ্লাসে মাছের আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছিল তাই ওই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল।'

কুঞ্জুপাতুম্মা জিজ্ঞেস করলঃ 'তুটাপীর ভাইজান বুঝি মাছ খান না?'

'ভাইজান সাধারণত নিরামিষই ভালো বাসেন। কখনও সখনও মাছ মাংস খান। তবে মাছ মাংস খেয়ে হাতমুখ খুব ভালো করে সাবান দিয়ে ধোন। মাছের আঁশটে গন্ধ বাড়ির চারিদিকে যেন না পাওয়া যায় এই হচ্ছে ভাইজানের আদেশ। আর তিনি যাকে বিয়ে করবেন সেই মেয়েটি কেমন হওয়া চাই শুনবে? প্রথমত ঘরের কাজ—অর্থাৎ কাপড়কাচা, ঘরদোর ঝরঝরে করে রাখতে জানা, আর রান্না জানা চাই-ই। রান্না আবার দুরকমই জানা চাই। মাংস পোলাও, মিষ্টি। আবার ঘণ্ট, শুকতো, চচ্চড়ি। বাগানের কাজ জানা চাই। আবার লেখপড়া জানা তো চাই-ই, সংগীত ও সাহিত্যের সমঝদারও হওয়া চাই। এমনই একটি সর্বগুণসম্পন্ন তিলোত্তমা পেলে তবেই তিনি বিয়ে করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।'

এইসব শোনার পর কুঞ্জুপাতুম্মার চোখে নিজার আহম্মদের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ভেসে উঠল! লোকটার ওপর রাগও হতে লাগল। আয়েষার ওপরও। ভাইজান এই বলেছে, ভাইজান ওই বলেছে, ওঃ ভারি এক ভাইজান! আয়েষা তখনও শেষ করে নিঃ

'আমার ভাইজানের মত এমন একজন ছেলে···শুনবে? একদিন রাত্রে ভাইজান ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে পড়ছিল। ওর হাত টেবিলের ড্রয়ারের একদিকে ছিল আমি দেখি নি। আমি খটাস করে ড্রয়ারটা খুলতেই 'পটাৎ' করে কি যেন ভাঙার একটা শব্দ পেলাম।

দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। ভাইজানের বাঁহাতের কড়ে আঙুলটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

'তারপর?'

'ভাইজান একটুও বিচলিত হলেন না। আমাকে বললেন, কাঁচিটা নিয়ে আসতে। আমি কাঁচি এনে দিলে পর ভাইজান সেই ভাঙা আঙুলটা কেটে ফেললেন।' এতখানি বলে আয়েষা বলল:,

'আমি যাচ্ছি। তুমি আমাদের বাড়ি আসবে?'

কুঞ্জুপাতুম্মার কানে কথাগুলি গিয়ে ঠিক ভিতরে পৌঁছোল না। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল—ভাবছিল এ তবে কি সেই।

আয়েষা আবার বলল: 'আসবে?'

'কোথায়?'

'বাবা বাবা, বুদ্ধু, আমাদের বাড়িতে।'

'আম্মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।'

ও বাড়ি গিয়ে আম্মাকে বলল—'আম্মা ওই বাড়িতে যারা এসেছে তারা মুসলমান। আমি একবার যাব ওদের বাড়িতে?'

'দূর হ পোড়ারমুখী, ওরা মুসলমান না ছাই, ওরা কাফের।'

'না আম্মা, ওরা মুসলমান। ওই দেখ ওদের আয়েষা আমাদের তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।'

আম্মা দেখল শাড়িপরা, ওপর কানে ফুটো নেই। আম্মা বললেন—

'ও আমার নসীব! ওরা আবার মুসলমান।'

'হ্যাঁ আম্মা ওরা মুসলমান। তুমি একটু আস্তে বল নইলে ও শুনতে পাবে। আমি একবার ওদের বাড়ি যাই?'

'তুই যদি আমার মেয়ে হস তো এই বাড়ি থেকে এক পা বেরোবি না।'

কুঞ্জুপাতুম্মা আয়েষার কাছে গিয়ে বলল: 'আমি তোমাদের বাড়ি কাল যাব।'

'কেন আজ কি হল ?'

'বাড়িতে একটু কাজ আছে। জল তুলতে হবে আরও এটা সেটা। কাল আমি আসার সময় একটা বড় তেঁতুলের ছড়া নিয়ে আসব—কেমন ?'

আচ্ছা বলে আয়েষা চলে গেল।

সেই রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কুঞ্জুপাতুম্মার চোখে ঘুম এল না। আগেই ও খোদার কাছে প্রার্থনা করেছে যেন আয়েষার ভাইজান না আসে। এখন আবার উল্টোটা কি করে প্রার্থনা করে। অবশেষে অনেক ভেবেচিন্তে ও প্রার্থনা করলো :

'খোদাতালা তুটাপীর ভাইজান……।'

'আমি মিথ্যে সাক্ষি দিতে পারব না।'

আম্মা নিশ্চয় করে বলেন :

'ওরা মুসলমান নয়। আনামকারের মেয়ে আমি, আমি বলছি ওরা মুসলমান নয়।'

কুঞ্জুপাতুম্মা বাপজানের মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

বাপজান কিন্তু কিছুই বললেন না।

আম্মা আবার শুরু করলেন :

'পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সব লক্ষণই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।' অর্থাৎ পৃথিবী যে-ধ্বংস হবে তার প্রমাণ আয়েষা, ওর বাপজান আর আম্মা।

'বউটা আবার মাথায় ফুল দিয়েছে, ফুল !'

'আয়েষার আম্মা ভালো করে চুল আঁচড়ে তাতে সুন্দর করে ফুল গোঁজেন। ফুল গোঁজাটা কি মুসলমানোচিত ? আর ওই মেয়েটারই বা সাজ-পোশাকের কি বহর। চুল শুধু আঁচড়ানো নয় তাতে আবার তুগুছি বিনুনি করে সামনের দিকে বুকের তুপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে।'

আয়েষা ওর চুল নানারকম ফ্যাশান করে বাঁধে। তাছাড়া

মেয়েটা ভীষণ হুল্লোড়ে। ছোটাছুটি, লাফালাফি, নাচানাচি, গান ইত্যাদি লেগেই আছে। একদিন পুকুরের কাছে বসে ও খুব ভক্তি-সহকারে একটা গান করছিল। কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবল বোধহয় আল্লার কাছে কিছু প্রার্থনা করা হচ্ছে। পরে ভাবল হয়ত কোন ভক্তিমূলক কবিতা বা গান। যাহোক গানের অর্থ ও কিছু বুঝতে পারল না কিন্তু গান শেষ হলে ভক্তিভরে 'আমেন' বলল। আয়েষা কিন্তু হাসল না; শুধু ওর সারা মুখটা লাল হয়ে উঠল। কুঞ্জুপাতুম্মা অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিল যে হাসি চাপতে গিয়ে ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ও আয়েষাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এক্ষুনি যে গানটা করলে তার মানে কি?'

আয়েষা বলল; 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না, সত্যি বলতে কি আমি এর মানে সবটুকু বুঝিয়ে বলতে পারব না। যখন ভাইজান আসবেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করো, তিনিই এই গানটি লিখেছেন কিনা। শোভাযাত্রায় গাইবার জন্যে এই গানটি তিনি লিখে দিয়েছিলেন। কলেজের মেয়েদের মিছিলে এ গান আমরা গেয়েছিও।'

'তুটাপী, তুমি গান করার পর আমি 'আমেন' বলেছি।'

'আমি লক্ষ্য করেছি।'

' "আমেন" বললে কি কোনও দোষ হয়?'

'বুদ্ধু, দোষ হতে যাবে কেন?'

'তাহলে আর একবার গাও, বড় সোন্দর গানটা।'

'বেশ তাহলে মনে ভক্তিভাব আন। যত অন্য চিন্তা বিসর্জন দাও এবং খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। পতাকা হাতে নিয়ে কলেজের মেয়েরা খুব একটা বড় শোভাযাত্রা করে চলেছে এবং ওরা, মানে আমরা, এই গানটা গাইতে গাইতে চলেছি এই রকম ভাবো।'

'ভেবেছি।'

'আচ্ছা এবার শোন।' আয়েষা আর একটা গান গাইল।

তারপর আয়েষা বলল—'গানটা যে সব ঠিক গাইতে পেরেছি

আমার তা মনে হয় না। হয়ত কোন কোন শব্দ ভুলে বাদ দিয়েছি। যদি দু-একটা কথা ভুলে যাই বা ছেড়ে দিই তাহলে ভাইজান আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।'

কুঞ্জুপাতুম্মা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভাইজান জানতে পারবেন কি করে?'

'জানতে পারবেন কি করে? তা বেশ। ভাইজান এসেই আমাকে ডাকবেন—লুটাপী এখানে এসে এই দাগের মধ্যে দাঁড়া। আমি সেই দাগের মধ্যে দাঁড়ালে পর ভাইজান বলবেন, গান কর। যদি না গাই তাহলে আমাকে দু হাজার টুকরো করে কেটে ফেলবেন। তারপর সেই দু হাজার টুকরো দু হাজার পাখিকে খেতে দেবেন। শেষে ওই পাখিগুলোকে ভাইজান বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে তাদের ভেজে খাবেন।'

'সে কি! বিসমিল্লা বলে তাদের ঠিকমত কেটে তারপর ভেজে খাবে না?'

আয়েষা বলল, 'বুদ্ধু, আমার মত একজন ভাল মেয়েকে মারার কথা হচ্ছে। কোরান ছুঁতে হলে আগে উজু করতে হয় কিন্তু যে কোরান চুরি করে তার কি উজু করার দরকার আছে?'

এইরকম ভাবে আয়েষা অনেক কিছু গল্প করে। কখনও কখনও খবরের কাগজ নিয়ে এসে তার থেকে অনেক খবর কুঞ্জুপাতুম্মাকে পড়ে শোনায়। কাগজে অনেক আশ্চর্য সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বাস করতেও কুঞ্জুপাতুম্মার কেমন যেন লাগে কিন্তু জিজ্ঞেস না করে ও আয়েষার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আয়েষা তখন সেই জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আর একবার পড়ে শোনায়। কুঞ্জুপাতুম্মার কাছে এসব খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়, ও সে কথা আয়েষাকে বলেও। এইভাবে একদিন কাগজ পড়তে পড়তে আয়েষা জিজ্ঞাসা করল, 'বহিনজান তোমার আম্মা বাপজান তোমায় লেখপড়া শেখান নি কেন? তোমাদের তো আগে অনেক ধন সম্পত্তি ছিল।'

ঠিকই তো। অনেক টাকাকড়ি তাদের ছিল। কোন কিছুরই অসুবিধে ছিল না। তখন যদি লেখাপড়া আরম্ভ করত তাহলে আজ হয়ত আয়েষার চেয়েও অনেক বেশী শিখে ফেলত। সবেতেই আজকের চেয়ে অনেক তফাত থাকত। বাপজান আম্মা কেন তাকে লেখাপড়া শেখান নি। কেন? কেন?

সেই রাতে আবার ওর মনে হল কেন ওকে লেখপড়া শেখান হয় নি, মাদুরে শুয়ে শুয়ে অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে ও বাপজানকে জিজ্ঞেস করল, 'বাপজান আমাকে আপনারা কেন 'লেখাপড়া শেখান নি?'

বাপজান কিছু না বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আম্মা বললেন: 'লেখাপড়া শিখিয়ে তোকে কাফের করে তোলা হবে নাকি?'

লেখাপড়া শিখলে, মূর্খতা দূর হলে মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়! এটা কি ঠিক?

পরের দিন কুঞ্জুপাতুম্মা এই প্রশ্নই আয়েষাকে করল। আয়েষা হাসল। কি ভাবে অজ্ঞানতা বেড়ে চলেছে দেখ। জ্ঞান যেমন বাড়ে, অজ্ঞানতাও বাড়ে। ও বলল, 'ইসলাম বলে জ্ঞান থাকা দরকার।'

কুঞ্জুপাতুম্মা এবার জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা আমাদের কি ঠিক কাফেরদের উল্টোটাই করতে হবে না?'

অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধতা করতে হবে না?

আয়েষা বলল, 'তাতো ঠিকই। কাফেররা পা দিয়ে হাঁটে, মুসলমানদের তাহলে মাথা দিয়ে হাঁটা উচিত। যেহেতু কাফেররা স্নান করে, দাঁত মাজে, আমাদের স্নান করার দরকার নেই।'

কুঞ্জুপাতুম্মা অভিমানভরে বলল: 'চুপ কর তুটাপী, আমাদের সঙ্গে কেন ঠাট্টা করছ?'

'বুদ্ধু, বুদ্ধু মেয়ে, আল্লাহ্ বা নবী যা বলে গেছেন তাতে এই রকম উল্টো দেখানোর কোন কথা নেই। মানুষের ভালো হওয়া চাই, জীবনে ভালোভাবে ভালো কাজ করে বেঁচে থাকা চাই। কাউকে

দুঃখ কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, সত্য কথা বলা দরকার। আল্লার ওপর, পয়গম্বরের ওপর বিশ্বাস রাখা দরকার···এইভাবে হাজারটা জিনিস আছে। যারা এই সব ঠিক ঠিক পালন করে তারা সত্যিকারের ইসলামের কাজ করছে। এখনও যদি বুদ্ধুর কোনও সন্দেহ থাকে তাহলে ভাইজান এলে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

এল একদিন আয়েষার ভাইজান, নিজার আহম্মদ, কুঞ্জুপাতুম্মার কল্পনার ভয়ঙ্কর লোক ! সভয়ে সে উঁকি মেরে দেখলে। আর সে যা ভেবেছিল তাই-ই—তার সেই উপকারী মানুষটিই নিজার আহম্মদ। এক আশ্চর্য আনন্দ ও বিস্ময় সে অনুভব করলে।

কিন্তু নিজার আহম্মদ আসবার পরেই এক কাণ্ড ঘটল। বাপজান একটা বড় দা নিয়ে নিজার আহম্মদের গলা কাটতে গিয়েছিলেন। গণ্ডগোলটা হল আম্মাকে নিয়ে।

নিজার আহম্মদ যখন এলেন সঙ্গে নিয়ে এলেন অনেক গাছ-গাছড়া, মনে হল কোথা থেকে যেন একটা বন তুলে নিয়ে এসেছেন। এইসব চারাগাছ কিভাবে কোথা থেকে এল কুঞ্জুপাতুম্মা তা জানতে পারে নি। বেশিরভাগই ফলের গাছ, সঙ্গে নারকোলের অনেক চারাগাছও। ওদের আঙ্গিনাটা একদিনেই বেশ একটা সুন্দর বাগান হয়ে দাঁড়াল। গাছগুলো সব এক এক লাইনে সমদূরত্ব রেখে পোঁতা হল।

সেদিন ওদের ওখানে ভয়ানক হইচই গণ্ডগোল—নিজার আহম্মদ, ওর বাপজান আর আয়েষা এই তিনজনে মিলে ওই রোদে অমনভাবে কাজ করছে দেখে কুঞ্জুপাতুম্মার খুব আশ্চর্য লাগল।

'আম্মা দেখে যাও, দেখে যাও'—বলে ও আম্মাকে ডাকল। আম্মা সেই পুরনো খড়ম জোড়া পরে খটখট, খটখট শব্দ করতে করতে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তারপর 'যতসব পাগলের আড়ৎ হুঃ' বলে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মার মোটেই মনে হল না যে ওঁরা পাগল।

ওর শুধু খুবই অদ্ভুত লাগল। জমিতে কাজ করতে ভদ্র

মুসলমানদের এই প্রথম দেখল। ওর ধারণা ছিল ইসলামে বলা হয়েছে যে মুসলমানেরা শুধু কেনাবেচার ব্যবসা করবে। আর যদি খুব দরকার হয় তাহলে মাটি কোপান ইত্যাদি। কিন্তু সে তো চাকরবাকরেরা করবে। নিজেরা নিজেদের জমি সাফ করে তাতে গাছ পুঁততে ভদ্রমুসলমানদের ও এই প্রথম দেখল।

ওর মনে একটু দুঃখ হল। ওদের ওই বিশাল আঙ্গিনা এমনিই পড়ে আছে। ফলফুল লাগানোর অনেক জায়গা আছে। আহা— ওর যদি একটা ভাই থাকত…ওর পক্ষে একা কিছু করা অসম্ভব। তবু নিজার আহম্মদ আসছে শুনে ইতিমধ্যে ও অনেক কাজ করে ফেলল। ওদের আঙ্গিনায় যত জঞ্জাল ছিল সব ঝাঁট দিয়ে জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলল, রান্নাঘরের দরজায় আটকান মাছের আঁশগুলো খুঁটে তুলে ফেলে দরজা জানলা সব পরিষ্কার করল, বাড়ির ভিতরের সব ঝুল ঝাড়ল, বাড়ির সামনে অনেক নোংরা ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়েছিল, সে সব আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। আর সবশেষে ও নিজেকেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর করে তুলল। ওর এইসব কাজকর্ম হইহই দেখে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'তোর এত কিসের আহ্লাদ রে ছুঁড়ী ? এত হইহই লাগিয়েছিস যে।'

ও চুপ করে রইল।

ওর সঙ্গে নিজার আহম্মদের দেখা হল ওই বাগানেই। কুঞ্জুপাতুম্মাকে দেখে প্রথমেই নিজার আহম্মদ জিজ্ঞেস করলে—

'তোমার হাতের ঘা শুকিয়ে গেছে ?'

'শুকিয়ে গেছে।' কুঞ্জুপাতুম্মা বলল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত নিজার আহম্মদ ওর হাতের ক্ষতের কথা মনে রেখেছে। সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার! নিজার আহম্মদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই কুঞ্জুপাতুম্মার মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। মন যেন দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, আগের সেই একাগ্রতা নেই। আর তার সঙ্গে কেমন যেন একটা ভয়, একটা আনন্দ, আর একটা অস্বস্তিও ওকে পেয়ে

বসল। নিজার আহম্মদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার আগে না পরে ওর মনের এমন অবস্থা হল তা কুঞ্জুপাতুম্মা ঠিক মনে করতে পারে না।

নিজার আহম্মদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাড়ি গিয়ে সে অনুভব করলে যেন তার বুকের ব্যাথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। মনে একটা ভয় তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও। শুধু তাই নয়—খাওয়া দাওয়ায় রুচি কমে গেল। এমনি ভাবে দু-একদিন যাওয়ার পর ঘটনাটা ঘটল।

নিজার আহম্মদ আর আয়েষা দুজনে মিলে গাছে জল ঢালছিল। তাই দেখতে দেখতে কিন্তু তাদের যেন দেখছে না—উঠনে ঘাস তুলছে এমন ভাব দেখিয়ে কুঞ্জুপাতুম্মা ওদের উঠনে বসেছিল। বেলা কত হয়েছিল ঠিক জানা ছিল না। রোদ সবে তেঁতুল গাছের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। রোজকার মত আম্মা খানায় পায়খানা বসার জন্যে ওপরে উঠছেন এমন সময় নিজার আহম্মদ ডাকলে—

'শুনুন, শুনুন একটা কথা শুনুন।'

আম্মা বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

নিজার আহম্মদ বললে—'আমাদের বাড়ির সামনে ওই খানায় পায়খানা করাটা কি আপনার উচিত হয়েছে?'

আম্মা বললেন, 'তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ খেয়াল রাখ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা ডাকল, 'আম্মা এদিকে এস।'

আম্মা নিজার আহম্মদকে আবার বললেন, 'তুমি আমার কি করবে?'

নিজার আহম্মদ হেসে ফেলল।

আম্মা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'মেয়েদের পেছনে লাগা?'

বাপজান এলে পর আম্মা বললেন, 'হায় ময়দীন, হায় খোদাতালা, আমাদের এখানে আর থাকতে দেবে না।'

'কী হয়েছে?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল, ওই খানার পাশ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। ময়দীন, আমাদের এখানকার বাস উঠিয়ে ছাড়বে, আর থাকতে দেবে না।'

'কে দেখছিল?' বাপজান চোখ লাল করে জিজ্ঞেস করলেন।

'ওই ছেলেটা।'

'কোন ছেলেটা'—বাপজান দা নিয়ে উঠনে নামলেন।

'কেটে এক্কেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলব, কোন ছেলেটা।'

'পাশের বাড়ির হামবড়াই ছেলেটা'—আম্মার বলা শেষ না হতে 'সেলাম আলেকুম' বলে নিজার আহম্মদ ওদের উঠনে এসে দাঁড়াল।

বাপজান ওর ছাঁটা চুল, ডানদিকে পরা ধুতি সব বক্র দৃষ্টিতে দেখলেন। তাহলেও নিজেকে সংযত করে কঠিন স্বরে বললেন, আলেকুম সেলাম।'

নিজার আহম্মদ বলল, 'আমরা আপনাদের পাশের বাড়ি থাকি। আমার বাপজান, আম্মা, আমার বোন আর আমি এই চারজন।'

'তোমরা মুসলমান?'

'হ্যাঁ।'

'কি রকম মুসলমান?'

'ধর্ম সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। আমাদের যে কেউ ধরে নিতে পারেন। যদি ভাবেন হিন্দু তো হিন্দু, খ্রীশ্চান ভাবলে খ্রীশ্চান। যাই হই না কেন আমরা, আমাদের নাকের সামনে এসে······?'

'তাই লুকিয়ে দেখবে?'

'বাপজান—' কুঞ্জুপাতুম্মা ভেতর থেকে ডাকল—'বাপজান।'

'কি খুকী?'

'আম্মা······' বলার আগেই আম্মা ওর মুখ চেপে ধরল—'হারামজাদী তুই আমার মান রক্ষা কর, আমি তোর আম্মা, আনামকারের মেয়ে।'

কুঞ্জুপাতুম্মা আম্মার হাত মুখ থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল ঃ

'আম্মা মিথ্যে কথা বলেছেন।'

'হায় হায় ময়দীন, আমি তোকে পেটে ধরি নি হারামজাদী?'

বাপজান বারান্দার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'কি বলছিলি ?'

'আমি মিথ্যে সাক্ষি দিতে পারব না'—কুঞ্জুপাতুম্মা আম্মাকে বলল। তারপর বাপজানকে বলল ঃ

'আম্মা তোমায় মিথ্যে বলেছেন।'

'কুঞ্জুপাতুম্মা,' আম্মা বললেন, 'তোর নানার একটা হাতি ছিল, এত্ত-বড় দাঁতালো হাতি।'

'তবুও আমি মিথ্যে বলতে পারব না।'

বাপজান আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি খুকী কী বলছিলি ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল, 'আম্মা তোমায় মিথ্যে কথা বলেছেন। পাশের বাড়ির আঙ্গিনা থেকে 'এই' বলে ডেকেছে। তারপর ওদের নাকের সামনে পায়খানা বসাটা ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করেছে। তাতেই আম্মা এই রকম তোলপাড় শুরু করেছেন।'

আম্মা কপাল চাপড়ে বলল ঃ 'খোদাতালা আমার কেউ নেই।'

'কুঞ্জুপাতুম্মা তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব' —বাপজান বললেন।

'হ্যাঁ তাই কর, আমায় মার, মেরে ফেল। হায় ময়দীন, আমার কেউ নেই। মার মার, খুন করে ফেল'—আম্মা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লেন। বাপজান বাইরে বেরিয়ে নিজার আহম্মদের কাছে গিয়ে খুব নরম ভাবে বললেন ঃ

'আমরা গরিব লোক, এখন কি করি ?'

নিজার আহম্মদ বলল ঃ 'আমরাও গরিব। আমাদের নিজেদের জমিজমা বলতে কিছুই নেই। শহরে আমরা বাড়ি ভাড়া করেই থাকতাম, এখন ওটা কিনে নিয়েছি। তবে আমার চাষবাসেই বেশী আগ্রহ।'

বাপজান বললেন ঃ 'আমাদের বাসস্থান এই বাড়ি আর আঙ্গিনা আমাদের নিজের, কিন্তু তবু আমরা কোনও উপায় দেখছি না। দেখছ তো আমাদের আঙ্গিনায় আড়াল টাড়াল কিছুই নেই।

আমাদের এখানে বেশিরভাগ লোক সন্ধের পরই রাস্তায় পায়খানা বসে। একদিন ছিল যখন আমাদের সবই ছিল। আগে আমাদের দেখলে যারা উঠে দাঁড়াত আজকাল আর তারা উঠে দাঁড়ায় না। সে যাই হোক, ওই খানাটা ছাড়া পায়খানা বসার জায়গা কোথায়? রাস্তায় বসাটা তো আরও খারাপ। তাই নয়?'

নিজার আহম্মদ বলল:—'রাস্তা তো ময়লা করার জায়গা নয়।'

'তাহলে লোকে কী করবে?'

'বাড়িতে বাড়িতে পায়খানা তৈরী করতে হবে। এর জন্য পয়সা বেশী খরচ নেই। সাত আটটা নারকেল পাতা, পাঁচ ছ'টা বাঁশের খুঁটি আর কিছু দড়ি, গর্ত খোঁড়ার জন্য একটা কোদালও চাই। একঘণ্টা কাজ করলে এক বছরের জন্য আর কোনও হাঙ্গামা পোহাতে হবে না। কেন যে লোকে এই কষ্টটুকুও করে না। আর এখানে তো জায়গার অভাব নেই। সুন্দর গ্রাম, নীল আকাশ, স্বচ্ছসলিলা নদী। আচ্ছা আমি যা বললাম তাই যদি করেন তাহলে আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কয়েকটা নারকেল পাতা, বাঁশের খুঁটি, দড়ি আর একটা কোদাল জোগাড় করতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—এতে কোনই অসুবিধে নেই।'

'তাহলে এগুলো সব জোগাড় করে আমাকে ডাকবেন।'

নিজার আহম্মদ ওদের বাড়িতে চলে গেল। বাপজান এইসব জিনিসগুলো আনতে গেলে আম্মা কুঞ্জুপাতুম্মাকে বললেন, 'তুই আমার মেয়ে নস।'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না।

আম্মা আবার বললেন, 'তোকে আমি পেটে ধরি নি।'

কুঞ্জুপাতুম্মা চুপ করে রইল।

'হারামজাদী তোর মুখে রা নেই কেন?'

কুঞ্জুপাতুম্মা চুপ।

'আমার সঙ্গে কথা বললে বুঝি তোর হাতের বালা খুলে পড়ে যাবে।'

কুঞ্জুপাতুম্মা এবার বলল, 'আমার হাতে বালা নেই।'

আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর আম্মা তোর কাছে বড় না ওই ছেলেটা ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না।

আম্মা বললেন, 'চেম্মীনটীমার অত লম্ফঝম্ফ এবার গেল কোথায়? কাণ্ডটা দেখ। ছেলেটা দুটো কথা বলতে না বলতে ওর সুরে সুর মেলাতে লাগল। নারকেল পাতা, বাঁশের খুঁটি, দড়ি, এসব কেন ? ঘর বাঁধা হবে বুঝি ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা চুপ করে রইল।

'তুই ওই ছেলেটার হয়ে সাক্ষি দিলি কেন ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা চুপ।

'তোর আম্মার মান রাখা তোর উচিত নয় কি ?'

'আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না।'

'কেন ? বললে কি তোর গলার হার খুলে পড়ে যাবে ?'

'আমার গলায় হার নেই।'

'তাহলে কারণটা কি বল, হারামজাদী।'

'বাপজান যদি দা দিয়ে ওর গলা কেটে ফেলত।'

'কেটে ফেলত তো ফেলত, আমাদের তাতে কী ?'

'বাপজানকে যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যেত ?'

আম্মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন :

'খোদাতালা ঠিকই তো'—তারপর কুঞ্জুপাতুম্মার কাছে এসে বললেন, 'আমার সোনা মেয়ে, তুই আমাদের সংসারটাকে বাঁচিয়েছিস ······তোকে আজ কদিন ধরে কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। কি হয়েছে রে ?'

'আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা আম্মা।'

'খোদাতালা—শয়তান না জীন তোর ঘাড়ে ভর করল কুঞ্জু ?'

পরের দিনই বাপজান পায়খানার জোগাড়যন্তর করে ডাকলেন নিজার আহম্মদকে—'কই হে নওজোয়ান—এস, জোগাড় তো সব করেছি, এখন তোমার কেরামতিটা দেখাও তো দেখি।'

নিজার আহম্মদ হঠল না ; বেরিয়ে এল সে। এবং—। তাজ্জব মানুষ ওই নওজোয়ান—সে লেগে গেল কাজে। বাপজান সাহায্য করতে গিয়েও পারলেন না, কী করতে হবে তা তাঁর মাথায় ঢুকল না। দাঁড়িয়েই রইলেন আর দেখলেন। কুঞ্জুপাতুম্মা আড়াল থেকে দেখছিল। পায়খানা বাড়ি থেকে দূরে আঙ্গিনার এক পাশে তৈরী হচ্ছিল বলে নিজার আহম্মদ আর বাপজানের কথাবার্তা ও শুনতে পায় নি। নিজার রোদে পুড়ে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করছিল। কিছুক্ষণ পরে বাপজান এসে বললেন, 'খুকী এক গ্লাস পানি নিয়ে আয় তো নিজার আহম্মদের জন্যে।'

কুঞ্জুপাতুম্মা রান্নাঘরে গিয়ে এক টুকরো সাবান নিয়ে একটা গ্লাস বেশ ভাল করে সাফ করে তার গন্ধ শুঁকলো। কোনও খারাপ গন্ধ কি পাওয়া যাচ্ছে ? না, কোনও গন্ধ নেই। তারপর ও পানি এনে বাপজানকে দিল। বাপজানের হাত থেকে গেলাস নিয়ে পানি খাবার আগে নিজার আহম্মদ একবার ছুতো করে গেলাসটা শুঁকে নিল। কুঞ্জুপাতুম্মা দূরে দাঁড়িয়ে সবই লক্ষ্য করছিল। ও ঠিকই দেখেছে যে গেলাসটা আগে শুঁকে নিয়ে নিজার আহম্মদ পানি খেয়েছে।

পায়খানা তৈরী শেষ হলে কুঞ্জুপাতুম্মা গিয়ে দেখল। বেড়া দেওয়া একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে একটা ছোট খানার মত। তার ওপর দুধারে দুটো তক্তা পাতা। মাটি সব একপাশে জড় করে রাখা হয়েছে। তার ওপর একটা নারকেল মালা। আয়েষা বলল—

'পায়খানা শেষ হলে মাটি ঢেলে দিতে হবে সেই-জন্যে ওই নারকেল-মালা। বছর খানেক পরে এই গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে আবার আর একটা গর্ত খোঁড়া হবে।

বাপজান বললেন: 'আমাদের এ বুদ্ধি একেবারেই মাথায় আসে নি। এমনভাবে সব বাড়ি বাড়ি পায়খানা তৈরী করলে

চারিদিকে গন্ধ ছড়াবে না, আমরাও সহজভাবে চলাফেরা করতে পারব।'

এরপর বাপজানের নিজার আহম্মদকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। তারপর বাপজানের নানা সংশয় নানা অবিশ্বাস কেটে যেতে লাগল। তিনি হাজারটা প্রশ্ন করেন নিজার আহম্মদকে। লোক যে এত পাজী, এত অহংকারী হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ এই যে পৃথিবী ধ্বংসের মুখে ?

নিজার আহম্মদ বলল, 'তা আমি জানি না। জন্মালে মরতে হবে এই আমরা জানি। আমিও মরব, আপনিও মরবেন, সকলেই একদিন মরবে। তারপর হয়তো একদিন এই পৃথিবীর অবসান হবে। কিন্তু তাতে কি ? অবসান যখন হবে তখন হবে। ততদিন পর্যন্ত ভালভাবে সৎপথে বেঁচে থাকতে হবে। লোকেরা অজ্ঞান, মূর্খ বলেই দুষ্টতা বেড়ে যাচ্ছে—অহংকারও। এদের সৎপথে নিয়ে যাবার জন্যে উপযুক্ত লোক চাই। আর তাই, ও খারাপ, এ খারাপ বলে তাদের দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের ভালোর জন্যে চেষ্টা করতে হবে।'

তখন বাপজানের আবার এক প্রশ্ন—

'গোখরো সাপের স্বভাব বদলান কি সম্ভব ?'

'সে আবার কী ?'

'গোখরো সাপের মত বিষেভরা মানুষও আছে। তারপর শেয়াল নেকড়ে, বাঁদর এদের মত স্বভাবের লোকও আছে।'

'এদের কি পোষ মানিয়ে মানুষের আদেশ পালন করতে শেখান হয় নি ?'

'তবু····· ?' এইভাবে ওরা দুজনে ওদের আলোচনা চালিয়ে যায়।

একদিন আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়মৎ তুমি কেন এখানে এইসব জঙ্গল তৈরী করেছ ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। মনে মনে বলল: 'আয়মৎ না, নিজার আহম্মদ ওর নাম।'

নিজার আহম্মদ বলল: 'এ সব জঙ্গল নয় আম্মা। দু তিন

বছরের মধ্যেই আপনাদের ভাল ভাল আম, পেয়ারা, পেঁপে সব খাওয়াব'।

আম্মা জিজ্ঞেস করলেন 'আয়মতের আম্মা কেন আমাদের এদিকে আসেন নি ?'

আয়েষা বলল, 'সেদিনকার সেই ঝগড়ার পর আম্মার ভয় লেগে গেছে।'

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

আমার বুকে কিসের ব্যথা ?

কুঞ্জুপাতুম্মার যে কী হয়েছে তা ও নিজেই জানে না। মসজিদের ইমামকে দিয়ে একটা মন্ত্রপড়া সুতো বাপজান ওর গলায় বেঁধে দিলেন। তাছাড়াও মোল্লার দেওয়া ছোট্ট একটা কবচও ওর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ওর ওপর যে শয়তান ভর করেছে, সে এই সবেতেও ওকে ছাড়ল না। একদিন আয়েষা এসে বলল; 'ভাইজান বলেছেন'—শুনে কুঞ্জুপাতুম্মা কান খাড়া করে রইল। ওর দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু নিজার আহম্মদ কি বলেছে শোনার জন্য উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু আয়েষার কথা শুনে কুঞ্জুপাতুম্মা বুঝতে পারল ওকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা করছে। ও বলল—

'ঠাট্টা করোনা তুটাপী।'

আয়েষা বলল, 'না, সত্যি ঠাট্টা করছি না। ভাইজানের চামড়ার স্যুটকেসটা তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিলে শয়তান কেন, শয়তানের বাপেরও সাধ্যি নেই যে তোমার ধারে কাছে ঘেঁষে। কী, নিয়ে আসি ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল, 'বুদ্ধু, চুপ কর, এত বাজে কথা বলে না'।

তারপর ওর কেমন যেন একটা দুঃখ হল। আয়েষা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে ?'

'আমার বুকে কিসের যেন ব্যথা।'

ব্যথা আসছে যাচ্ছে এমন ব্যথা নয়। সমস্ত বুক জুড়ে একটা চাপা বেদনা। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কান্না পেয়ে যায়। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে হাসি। কান্নার চেয়ে ওর হাসতেই বেশী ভালো লাগে কিন্তু জোরে জোরে নয়। কি যেন মনে করে মৃদুমন্দ হাসে, বাস্, তারপরই বুক ফেটে কান্না আসে। নিজার আহম্মদকে

দেখলে ওর গাল দুটো কি এক আবেগে থরথর করে কাঁপে—বুকের মধ্যে চাপা ব্যথাটা যেন ফেটে পড়তে চায়। নিজার আহম্মদকে অভিমানভরে জিজ্ঞেস করতে সাধ যায় 'কেন আমায় দেখছ?' কিন্তু তারপর যদি নিজার আহম্মদ ওর দিকে আর না তাকায়। নিজার আহম্মদের দৃষ্টিপথে পড়ার জন্য ওর কত লুকোচুরি, কত ছলনা। নিজেকে নিজে বোঝায়, আমি তো শুকনো ডালের কাঠি কুড়োতে এসেছি। যে কোনও সূত্র ধরে ও নিজার আহম্মদের বাড়ি যাবে। আগুন নিয়ে আসাটা সবচেয়ে বড় কারণ, নয় তো নুন! যদি নুনেরও দরকার না থাকে তা হলে আয়েষার সঙ্গে কথা বলার দরকার। যে কোনও ছুতো করে ও আয়েযাদের বাড়ি গেলেও সব সময় ওর সুবিধে মত নিজার আহম্মদের দেখা মেলে না। কোন না কোন কাজে নিজার আহম্মদ সব সময় ব্যস্ত। হয় উঠোন পরিষ্কার করছে, নয় গাছে জল ঢালছে। উঠোন এত পরিষ্কার করার কি আছে রে বাবা! উঠোন ভর্তি পরিষ্কার ঝকঝকে সাদা বালি ঢেলেছে। উঠোনের চারিদিকে গাছগুলোতে সব ফুল ফুটেছে, তবুও ওর কাজের বিরাম নেই। কাজ না থাকলে পড়া। কুঞ্জুপাতুম্মা মনে মনে বলেঃ 'বাবা! এত পড়ারই বা কী আছে?'

একদিন কুঞ্জুপাতুম্মা দেখল নিজার আহম্মদ একটা গাছের ছায়ায় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। বুকে একটা বই।

কুঞ্জুপাতুম্মার হৃদয়-সমুদ্র উথলে উঠল। কেমন যেন একটা সুখ শিহরণ ও সারা দেহে অনুভব করল। নিজার আহম্মদের চোখ ছিল আকাশের দিকে। পশ্চিম আকাশে যেখানে অস্তমিত সূর্যের রশ্মিতে মেঘের ওপর নানা রঙের খেলা শুরু হয়েছে সেইখানে। দূরে উড়ে যাওয়া পাখিদের পাখায় পাখায় সেই বর্ণের ছটা।

কুঞ্জুপাতুম্মার তাড়া পড়ে গেল। সেদিন ও সাদা পোশাক পড়ে ছিল। অনেকদিন ধরে ব্যবহার না করার ফলে ওর মুণ্ডু একটু ছোট হয়ে গিয়েছিল, একেবারে দেহের সঙ্গে এঁটে লেগে ছিল। মাথায় ছিল পাতলা ভয়েলের তাট্টা। কেন যে সেদিন ও অমনভাবে সেজে

গুজে ছিল তা ও নিজেই জানে না। ঘরের মধ্যে গিয়ে আয়নায় অনেকক্ষণ ও নিজের মুখ দেখল। চোখের পাতায় ওর যেন ঘন কাজল লাগানো এমনই গভীর কালো। গালের সেই কালো তিলটা যেন একটা কাজলের ফোঁটার মতো জ্বলজ্বল' করছে। বড় বড় চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে অনেকক্ষণ ও নিজেকে দেখল, তারপর মৃদু হাসল। হঠাৎ চোখে ওর কান্না ঘনিয়ে এল কিন্তু ও হাসল।

মুখ চোখের ভাব স্বাভাবিক করে ও নিজার আহম্মদের বাড়ির দিকে চলল। বুক ওর তখন ঢিপঢিপ করছে।

নিজার আহম্মদের দৃষ্টি ওর দিকে পড়ল। সেই দৃষ্টিতে কি যেন এক প্রসন্নতা।

কুঞ্জুপাতুম্মা বাড়ির ভিতর গিয়ে একটা কাঠিতে করে আগুন নিল। আয়েষা বা ওর আম্মার সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি ফিরল। ফেরার সময় নিজার আহম্মদ ওকে ডাকল, 'এই'।

নিজার আহম্মদের সেই ডাক ওর বুকের ভিতর বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে দিল। আর এক পা-ও এগোতে না পেরে ও ওইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত শরীর তখন ওর কী এক আবেগে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় ও আনন্দ।··· হৃদয়ের এই আবেগ ভরা অনুভূতি নিয়ে সে নিজার আহম্মদের দিকে তাকাল। নিজার আহম্মদ ওর দিকে এগিয়ে এল।

'আমার একটু আগুন চাই' বলে ও কুঞ্জুপাতুম্মার হাত থেকে আগুনের কাঠিটা নিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল :

'কুঞ্জুপাতুম্মা, আমাদের সেই চড়াই পাখিটা না, আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছিল যে, কুঞ্জুপাতুম্মা কেমন আছে ? আমি বললাম যে, কি যেন শয়তান তাড়াবার জন্য কুঞ্জুপাতুম্মা গলায় একটা স্যুটকেস ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'আগুন দিন।'

'কুঞ্জুপাতুম্মা।'

'কি ?'

'তোমার কী হয়েছে ?'

'আমার বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা ব্যথা।'

'তার জন্য গলায় কিছু ঝুলোলেই ব্যথা চলে যাবে ?'

'আগুন দিন।'

'কুঞ্জুপাতুম্মা, তুমি লিখতে পড়তে শিখেছ ?'

'আমায় কেউ শেখায় নি।'

'আয়েষাকে বলো কাল থেকে তোমায় পড়াতে। বলবে তো ?'

'তুটাপী আমাকে নিয়ে মজা করবে।'

'লুটাপী তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমি ওকে তুহাজার টুকরো করে……।

'না, না তুটাপীকে কিছু করতে হবে না। আগুন দিন।'

'আচ্ছা আমি লুটাপীকে বলব, কেমন ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা কোনরকমে আগুন চেয়ে নিল। ওর মনে হল, ওর যেন পাখা গজিয়েছে—এখনই উড়ে চলে যেতে পারে কিন্তু তবুও সে আস্তে আস্তে চলল। সমস্ত পৃথিবী যেন এক নতুন সূর্যালোকে স্নান করছে। সমস্ত কিছু ওর চোখে সুন্দর লাগল। সব কিছুরই ওপর ওর স্নেহ উথলে উঠল। একটা পিঁপড়ে ওকে কামড়ালে কুঞ্জুপাতুম্মা ব্যথা পেয়ে বলল ঃ

'আমাকে যেমন কামড়ালি, আর কাউকে যেন অমন করে কামড়াস নি—' বলে পিঁপড়েটাকে খুব সাবধানে তুলে নীচে রেখে দিল। সে রাত ওর কাছে সবচেয়ে সুন্দর মনোহর এক রাত্রি বলে প্রতিভাত হল। আম্মা, বাপজান ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু ওর চোখে ঘুম এল না। নিজার আহম্মদের কথা মনে হতেই ওর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। অভিমান ভরে নিজার আহম্মদকে ও কি যেন বলল। মাথার বালিশটাকে তুহাত দিয়ে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'কী' ব্যথা লাগছে ?' তাই জিজ্ঞেস করতে করতে ওর তুচোখ জলে ভরে উঠল। আবার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল। এমনি ভাবে রাত গড়িয়ে চলল, তারপর এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুরে ভাত খাওয়ার পর যখন উঠোনে এমনি দাঁড়িয়েছিল তখন আয়েষা হাতে একটা বড় কঞ্চি আর বগলে বই-খাতা নিয়ে বেশ গম্ভীরভাবে কুঞ্জুপাতুম্মাকে ডাকল। কেন, কুঞ্জুপাতুম্মা তা বুঝতে পারল না। তেঁতুল তলায় ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আয়েষা গোল করে একটা দাগ কাটল।

'ঠিক দাগের মাঝখানে দাঁড়াও—' আয়েষা আদেশ করল।

'কেন তুটাপী ?'—বলে কুঞ্জুপাতুম্মা দাগের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

'ডান হাত বাড়াও'—আয়েষা আবার আদেশ করল।

'কেন আমায় মারবে নাকি ?'

'হাত বাড়াও।'

কুঞ্জুপাতুম্মা হাত বাড়াল। আয়েষা ওর হাতে একটা পেন্সিল, খাতা আর একটা 'বর্ণ পরিচয়' দিল। বলল ঃ

'আজ থেকে আমি তোমার গুরু।'

কুঞ্জুপাতুম্মা হাসল।

আয়েষা বলল ঃ 'আচ্ছা, আজ থেকে আমার অজানা কোনও কিছু তোমার থাকবে না। সমস্ত খুলে বলতে হবে, তারপর আমি তোমায় পড়াব। আচ্ছা আমার ভাইজান বলে যে মহান্ ভদ্রলোকটি আছেন তাঁর সঙ্গে তোমার…… ?'

'বাজে বকোনা তুটাপী।'

'সব খুলে বল, নইলে হাতে কঞ্চি দেখছ তো ?'

শীগ্‌গির বলো, নইলে তোমাকে আমি চার হাজার টুকরো করে কাটব।'

কেন ঠাট্টা করছ তুটাপী।'

'বল শীগ্‌গির।'

'কী বলব ?'

'আমার ভাইজানের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?'

যেন কুঞ্জুপাতুম্মাকে চিমটি কেটে ব্যথা দিতে যাচ্ছে এমনভাবে ও জিজ্ঞেস করল।

'চুপ কর তুটাপী'

আয়েষা কিছু বলল না। একটু সময় চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'বহিনজান ডান্স জান?'

ডান্স আবার কি? কুঞ্জুপাতুম্মা বুঝতে পারল না।

'আমি জানি না।'

'কাপড় কাচা, রান্না, ছবি আঁকা—এই সব?'

'কি সব বলছ তুটাপী। আমি এসব কিছুই জানি না। তুমি যদি আমায় শিখিয়ে দাও তো শিখব।'

'তা হলে শোন, ছেলেদের মত বুদ্ধু এ পৃথিবীতে আর কেউই নেই।'

'ছিঃ তুটাপী, অমন করে বলতে নেই।' তারপর ও আয়েষার মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। দুটো তিনটে পিঁপড়ে একটা মরা মাছিকে টেনে দিয়ে যাচ্ছিল তাই দেখিয়ে কুঞ্জুপাতুম্মা বলল—

'তুটাপী, এখন "সজ্‌তল মুন্‌তাহা"র একটা পাতা নিশ্চয়ই পড়ে গেছে। দেখ, পিঁপড়েগুলো একটা মরা মাছিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

আয়েষা বলল, 'আমরা এখন গভীর বিষয়ে আলোচনা করছি। বহিনজানের লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা তা হলে যা জিজ্ঞাসা করছি তার ঠিকমত জবাব দাও। আমার ভাইজানের সঙ্গে তোমার কখন আলাপ হয়?'

'আমাকে পড়তে শেখাও তুটাপী।'

'তোমার তো আগে আমার সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল না কী··· ?'

'না তুটাপী।'

'কী!' আয়েষা খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে আগে নয়?'

'না।'

'তা হলে ব্যাপারটা শুনি।'

‘আমি তখন তোমাদের কুয়োতে ছান, না স্নান, করতে আসতাম—তুমি তোমার আম্মা বাপজান সব আসার আগে। একদিন স্নান করতে আসার সময় দেখি ছুটো ‘বর-বউ’ চড়াই পাখি খুব ঠোকরা-ঠুকরি করছে। বর পাখিটা বউকে এমন ঠোকরাতে লাগল যে বেচারা পাখিটা গাছ থেকে খানায় পড়ে গেল। তা পাখিটাকে খানা থেকে তুলতে গিয়ে আমিও পড়ে গেলাম। আমার শরীরের নানা জায়গায় ছড়ে গেল আর হাত কেটে খুব রক্ত পড়তে লাগল। আমি পাখিটা মরে যায় দেখে ওর ঠোঁটে ছুফোঁটা রক্ত দিলাম। পাখিটার পেটে ছুটো ডিম ছিল। তখন তোমার ভাইজান……’

‘ভাইজান!’

‘তোমার ভাইজান তখন ওখানে ছিলেন। তিনি এসে খানায় নেমে আমার হাতের কাটা জায়গাটা বেঁধে দিলেন। তারপর আমাকে ওপরে উঠিয়ে দিয়ে স্নান করার সময় বাঁধা জায়গাটা ভিজোতে বারণ করলেন।’

‘আর চড়াই পাখির কী হল ?’

‘সে উড়ে তার বাড়ি চলে গেল।’

‘ওহো, এই হচ্ছে ব্যাপার।’ তারপর আয়েষা কতকটা নিজের মনেই বলল ; ‘এই হচ্ছে কুঞ্জুপাতুম্মার অদ্ভুত কীর্তি।’

‘কি তুটাপী কী বলছ ?’

‘কিছু না—ছেলেদের মত বোকা ছুনিয়াতে…’

‘চুপ কর তুটাপী। অমন করে বলতে নেই।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। আমি এবার তোমায় পড়াতে যাচ্ছি। মন দিয়ে শোন।’

তারপর আয়েষা মাটিতে ‘ব’ এই অক্ষরটা লিখল।

‘ভালো করে দেখ এই রকম একটা অক্ষর এই বইয়ের মধ্যে আছে কিনা’—বলে ও ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

কুঞ্জুপাতুম্মা বইয়ের সব জায়গায় দেখল। নাঃ, কোথাও ওই অক্ষরটা নেই। শেষে ও বইয়ের ওপরের পাতায় ‘ব’ অক্ষর দেখতে পেল।

আয়েষা উঠে বসল : আচ্ছা তাহলে এই অক্ষরের নামটি হচ্ছে 'ব'। 'ব' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এমন কতকগুলো শব্দ বল।'

'বালো।'

'বালো! বুদ্ধু মেয়ে, বালো না, ভালো বলতে হয়।'

'ভালো।'

'আচ্ছা ভালোয় 'ব' আছে।'

'না।'

'তাহলে 'ব' দিয়ে আর একটা শব্দ বল।'

'বড়।'

এমনিভাবে কুঞ্জুপাতুম্মা লিখতে পড়তে আরম্ভ করল। সকাল সন্ধ্যে যখনই সময় পায় তখনই ও পড়ে। আম্মা আর বাপজান কিন্তু কিছু জানল না। আম্মা দেখতে পেলে ঠিক ওকে গালাগালি করবেন। আম্মা আজকাল আবার খুব নামাজ পড়তে শুরু করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা চলে। আর তারই মধ্যে মুখও চলছে অনর্গল। কুঞ্জুপাতুম্মা রান্না ঘরে মাদুর বিছিয়ে পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে কত যে সংশয় কত যে প্রশ্ন। সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত সংশয়ের সমাধানের জন্য যখন তখন ও আয়েষার বাড়ি ছুটে যায়। ওর সমস্ত দেহমন কি যেন এক মধুর অনুভূতিতে ভরে উঠছে। কি যেন এক মিষ্টি জ্বালা।

একদিন আয়েষার আম্মা চড়াই পাখির বিষয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। কুঞ্জুপাতুম্মার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

আয়েষা বলল, 'দেখ দেখ, ওর মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে।'

আয়েষার কথা শুনে ওর কান্না পেল। আয়েষার আম্মা হেসে কুঞ্জুপাতুম্মার মাথায় হাত বোলালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন :

'কুঞ্জুপাতুম্মা, তুমি বুঝি চুল আঁচড়াও না?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল : 'আম্মা বলে যে ভালো করে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ালে নাকি কাফের হয়ে যাব।'

আয়েষার আম্মা মৃদু হাসলেন। তিনি একটা চিরুনি নিয়ে এসে

কুঞ্জুপাতুম্মার চুল আচড়াতে লাগলেন। কুঞ্জুপাতুম্মার সারা মুখ জ্বলতে লাগল। আয়েষার আম্মা খুব সুন্দর করে সিঁথি কেটে ওর চুল বেঁধে দিলেন। আয়েষা কতকগুলো বেলফুল তুলে ওর মাথায় গুঁজে দিল।

'মাথায় যে ফুল দিলে? শয়তান চড়ে বসবে না তো?'

'গিয়ে চড়াই পাখিকে জিজ্ঞেস কর।'

'ঠাট্টা করো না তুটাপী।'

কুঞ্জুপাতুম্মা খুব আহ্লাদিত আর লজ্জিত মন নিয়ে বাড়ি ফিরল। ওর আম্মা ওকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল ঃ

'হারামজাদী তোর হয়েছে কী? তোর মাথায় ওগুলো কী?' তারপর ওর চুলের মুটি ধরে সব চুল এলোমেলো করে দিয়ে ফুলগুলো ফেলে দিল।

'ওরা যেমনভাবে দেখায় তেমনভাবে দেখানোর দরকার তোর নেই, বুঝলি হারামজাদী। ওই মেয়েটার নানা গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ছিল। তুই আনামকারের সোনার মেয়ের সোনা মেয়ে। তোর নানার একটা হাতি ছিল। এই এত্তো-বড় একটা দাঁতালো হাতি।'

কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বলল না। সেই দিনই ও আর-একটা খবর শুনল। শীগ্গিরই ওর বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করা হচ্ছে। বাপজান ছেলে খুঁজছেন। কথাটা শুনে কুঞ্জুপাতুম্মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর গলা শুকিয়ে গেল---জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল। ফ্যাকাশে শুকনো মুখ নিয়ে ও ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

আম্মা বলল: 'আমাকে না বলে তুই এই বাড়ির বাইরে পা দিবি না।'

কুঞ্জুপাতুম্মা চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। ও "আল্লাহ্" বলে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'ময়দীন, পয়গম্বর আমার মেয়ের কি হল গো' বলে আম্মা চেঁচিয়ে উঠলেন। বাপজান ছুটে এলেন। চোখে মুখে জল দেওয়া হল, পাখার বাতাস দেওয়া হল। হইহই গণ্ডগোল লেগে গেল।

খানিক পরে কুঞ্জুপাতুম্মা উঠে বসল। ও ভালো করে ওর বাপজান আর আম্মাকে দেখল। ওকে না জিজ্ঞেস করে ওর মত না নিয়ে ওর বিয়ে ঠিক করা হয়েছে।

বাপজান ডাকলেন, 'খুকী-কুঞ্জুপাতুম্মা।'

কুঞ্জুপাতুম্মা চুপ করে রইল।

আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সোনার মেয়ের কি হয়েছে?'

কুঞ্জুপাতুম্মা কোন উত্তর দিল না।

আম্মা বলল: 'ময়দীন, কোনও শয়তান এসে ভর করল না তো।'

কুঞ্জুপাতুম্মা হা হা করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতে চায় না। তারপর কান্না, হৃদয়ের সব ব্যথা উজাড় করে দেওয়া কান্না। রাত অনেক হল, সমস্ত চরাচর ঘুমিয়ে পড়ল, তবু ওর কান্না থামল না।

রাতে শুয়ে ও জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চাইল। ভীমকায়

কাল একটা বড় মাকড়সার জালের মধ্যে বন্ধ হয়ে ছটফট করছে যে ছোট ছোট আলোর বিন্দু—ওগুলো কি তারা ?

সকাল না রাত কিছুই কুঞ্জুপাতুম্মা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিল না। খিদে নেই, ঘুম নেই, সব যেন এক স্বপ্নের ঘোর। কে আসছে, কে যাচ্ছে, কী জিজ্ঞেস করছে। ও কি জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে? আয়েষা না কে যেন কি জিজ্ঞেস করল। ও উত্তরও দিল—আবার সেই একই প্রশ্ন। কুঞ্জুপাতুম্মার হৃদয় মন কী এক ব্যথায়, কী এক বেদনায় যেন ফেটে যাচ্ছে। হৃদয়ের সব ব্যথা উজাড় করে দিয়ে ও চিৎকার করে বলে উঠল—

'তুটাপী, এরা আমার বিয়ে দিচ্ছে।'

তারপর কান্না। অজস্র কান্না, সমস্ত ব্যথা উজাড় করে দেওয়া কান্না। কান্নার সমুদ্রে ও যেন ভাসছে। অন্ধকার পৃথিবীর এক কোণে যেন একটা লাল শিখা জ্বলছে। বোধহয় সূর্য উঠছে কিন্তু কই কাক ডাকছে না তো! হাজার পাখির কলরব তো শোনা যাচ্ছে না। লোকেরা কি সব বলাবলি করছে। আম্মা বাপজান আরও কে কে যেন। না, সূর্যোদয় নয়। উঠোনে একটা গর্ত করে তার মধ্যে কাঠকয়লা জ্বালানো হয়েছে। গর্তের চারিপাশে মাটির প্রদীপে আলো জ্বলছে। কুঞ্জুপাতুম্মাকে এই আগুনের কাছে একটা পিঁড়েতে বসান হয়েছে। সামনে হাতে বেত নিয়ে কে যেন কি সব মন্ত্র পড়ছে।

শয়তান তাড়াবার মোল্লা।

এই প্রথম কুঞ্জুপাতুম্মার রাগ হল, ভয়ানক রাগ। ওর মনে হল যেন হাতির মত চিৎকার করে ওঠে, নয়ত বাঘের মত গর্জন করে ওঠে। লাফিয়ে পড়ে সকলকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

কিন্তু কিছুই না করে ও চুপ করে বসে রইল। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। মোল্লা ওর মাথার চারদিকে কি যেন একটা ঘুরিয়ে আগুনে ফেলল। তার সঙ্গে ধুনো আর চন্দন। মোল্লা কি সব মন্ত্র পড়ছিল। জীন, ইফরীত, শয়তান তাড়াবার জন্যে হাতে বেত।

ওঃ ওই বেত দিয়ে ওকে মারা হবে। ওর চুল মুঠো করে ধরে

ওর পিঠে গায়ে হাঁটুতে মারা হবে। হ্যাঁ, এমনি করেই শয়তান তাড়ান হয়। তাতেও যদি শয়তান না পালায় তাহলে চোখে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ডলা হবে। আগুনের মধ্যে ওর হাত ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তখন ওর হাতের চামড়া পুড়ে কাল হয়ে যাবে। ওর সর্বশরীর ব্যথা করবে। অসহ্য যন্ত্রণা। হোক—ওর আম্মা বাপজানের তো এতে সম্মতি আছে।

'বাপজান আমাকে মারতে বারণ কর।'

মোল্লা, বাপজান, আম্মা, কেউই কিছু বলল না।

'তুটাপী, আমাকে মারতে বারণ কর, ও মনে মনে বলল। যেন আয়েষাকে বললে আয়েষা আর কাউকে বলবে।

'বল্ শীগ্‌গির তুই কে ?' মোল্লা আদেশের সুরে বলল, 'কে তুই এর দেহে ভর করেছিস ?'

যদি কেউ দেহে ভর করে থাকে তাহলে তো বলবে কিন্তু কেউ তো দেহে ভর করে নি। মোল্লা আবার জিজ্ঞেস করল। তিনবারের বার বেতের বাড়ি সপাসপ ওর দেহে পড়তে লাগল। তারপর যে কি হল ওর ভালো করে মনে নেই। মোল্লা ওকে দশ বারো বার বেত মারল, তারপর আর সহ্য না করতে পেরে কুঞ্জুপাতুম্মা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তারপর হঠাৎ মোল্লার হাত থেকে ছড়িটা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে টুকরো টুকরো করে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। যেদিকে চোখ যায় ছুটে পালাতে চাইলে সে, পালাবে সে, পালাবে। পালাতেও গেল কিন্তু পারল না। থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ও কে ? ও কে ? আগুনের পাশে ? নিজার আহম্মদ দাঁড়িয়ে আগুনের পাশে। কখন এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর কি হল মনে নেই।

নিজার আহম্মদ ওকে টেনে নিয়ে নিলে, না ও নিজার আহম্মদের দিকে ছুটে গেল সে ও জানে না। না, জানে না !

তবে এইটুকু মনে আছে যে, নিজার আহম্মদ ওকে তুলে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মাদুরে শুইয়ে দিয়েছিল। যখন ও চোখ খুলল তখন সকাল। আয়েষা আর আয়েষার আম্মা ওর কাছে বসে।

কুঞ্জুপাতুম্মার আম্মা কি যেন বেটে নিয়ে এসে ওর কপালে প্রলেপ দিলেন। আঃ কি ঠাণ্ডা! কিন্তু ওর নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছিল যেন আগুনের হলকা।

ওর বাপজান ঘরের মধ্যে এলেন। আয়েষা আর আম্মা উঠে গেল। বাপজান জিজ্ঞেস করলেন ঃ

'সোনা তোর কী চাই ?'

'চাই না, কিছু চাই না, খিদে নেই, তেষ্টা নেই।'

'আজ কতদিন যে হল তুই মুখে কিছু দিস নি—' বাপজান খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন।

ও ঃ বাপজানের তাহলে দুঃখ হয়েছে। আর দুঃখ করতে হবে না। ও তো মরতে বসেছে। বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে···পাতা এক্ষুনি ঝরে পড়বে। সত্যি সত্যিই বাতাস বইছিল। বাতাস না ঝড়। ঝড়ে পাতা সব উড়ে খসে পড়ছে। গাছেরা মাথা কুটছে। হ্যাঁ, মরণের ঝড়। বোধহয় পৃথিবী শেষ হতে চলেছে। ইস্রাফীল দেবদূত শিঙায় ফুঁ দিয়েছে। শেষ দিন এগিয়ে আসছে। গাছ সব শেকড়সুদ্ধ উপড়ে যাচ্ছে, পাহাড় ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে······ পৃথিবী বোধহয় শূন্য হয়ে যাবে।

বৃষ্টি পড়ছে। মাটিতে সোঁদা গন্ধ লোকেরা হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছে। তাদের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এখন দিন, চিলের ডাক ও শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। তবু ও বেশ অনুভব করছে দূরে, বহুদূরে নীল আকাশের বুকে পাখা মেলে দিয়ে চিল ভেসে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে দিনও নয় রাত্রিও নয়, এমন অবস্থা। ও নড়তে পর্যন্ত পারছে না। সর্বাঙ্গে ব্যথা, অসহ্য বেদনা। কে যেন ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এমন ব্যথা। হাজার হাজার টুকরো করে ফেলেছে ওর দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বোধহয় সেই টুকরোগুলো পাখিগুলোকে দেওয়া হবে। পাখিরা সেই টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়ে দলে দলে উড়ে চলবে। তারপর ?···?

'কুঞ্জুপাতুম্মা।' কে ডাকল ? কে ? ও চোখ খুলল। চোখ খুলেই ভয়ে ওর ভিতরটা শুকিয়ে গেল। নিজার আহম্মদের বাপজান ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন ঃ

'ঘরের মধ্যে আলো বাতাসের দরকার। ওদিকের জানলাগুলো সব বন্ধ কেন ?'

তিনি জানলাগুলো খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের এক ঝলক আলো আর বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। উঃ, আলোর কি তেজ।

'কুঞ্জুপাতুম্মা,' আবার তিনি ডাকলেন।

'অ্যাঁ'—ওর মুখ দিয়ে শব্দ বের হল, কিন্তু শব্দ কি জোরে হল ? নিজার আহম্মদের বাপজান কি শুনতে পেলেন ? তিনি বাইরে গিয়ে বাপজানকে কি যেন বললেন। কি বলছেন উনি ? উঃ, এমনভাবে আর শুয়ে থাকতে পারা যায় না। না ঘুমিয়ে সারাদিন এমনভাবে শুয়ে থাকা কি কষ্ট। এমনভাবে জেগে শুয়ে থাকার চেয়ে ও যদি ঘুমিয়ে পড়তে পারত তো বেশ ভালো হত। ঘুম যেন কালো সমুদ্র, আর ও তাতে যেন গলে গলে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু তাও ভালো লাগে না। পারে না এমন ভাবে দিন কাটাতে। আলো চাই, আলো—কোথাও কিছু আঁকড়ে ধরা চাই। কোনও অবলম্বন ছাড়া জীবনে বাঁচা অসম্ভব। ও যেন একটা গাছ—মাটি আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চুলগুলো যেন গাছের শেকড়, হাত পা যেন গাছের ডালপালা, অনেক পাতা গজাতে শুরু করেছে, অনেক ফুল ফোটা আরম্ভ হয়েছে। দুটো পাখি তাতে বাসাও বাঁধতে যাচ্ছে। ও দুটো কী পাখি ?

'কুঞ্জুপাতুম্মা।' কে যেন ওর গা নাড়া দিল। এ স্বর আগে যেন ও শুনেছে কোথায় ? অলসভাবে ও চোখ দুটো খুলল। কে—কে ? ওঃ নিজার আহম্মদ।

'কুঞ্জুপাতুম্মা।' নিজার আহম্মদ ডাকল। তারপর বলল ঃ 'কুঞ্জুপাতুম্মা উঠে এই ওষুধটা খেয়ে নাও। ওষুধ তেতো কিন্তু মিষ্টি মনে করে খেয়ে ফেল। এর স্বাদ দেখো না।'

কুঞ্জুপাতুম্মা ভাবল যে বলে, ওষুধ ওর চাই না। কিন্তু তার আগেই নিজার আহম্মদ ওকে উঠিয়ে বসিয়ে কি যেন একটা কালো ওষুধ খাইয়ে দিল। তারপর কি যেন সব বলল। ও কি উত্তর দেবে ভাবতে গিয়ে দেখে নিজার আহম্মদ নেই। ওর আম্মা খুদের ফেনাভাত নিয়ে ওকে খাওয়াচ্ছে। আম্মা জিজ্ঞেস করল—

'আয়েষার আম্মা তোকে যেমন করে চুল বেঁধে দিয়েছিল তেমন চুলবাঁধা চাই ?'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল ঃ 'আমি মরতে যাচ্ছি।'

'আমার সোনা মেয়ে অমন কথা বলতে নেই। তোর বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

কুঞ্জুপাতুম্মা বলল, 'আমার বিয়ের দরকার নেই। আমি মরতে যাচ্ছি।'

'ওহো, তুমি মরতে যাচ্ছ'—বলে হাসতে হাসতে আয়েষা ঘরে ঢুকল।

'কী, ওষুধ খুব মিষ্টি না ?'

'যাও তুটাপী।'

'শুধু একজন ওষুধ দিলে তুমি খাবে, আর কেউ দিলে নয়। না ?'

'ঠাট্টা করোনা তুটাপী।'

কুঞ্জুপাতুম্মা চুপ করে শুয়ে রইল। হৃদয় যেন ওর মধুতে ভরে গেছে। শুধু হৃদয় নয়, সমস্ত দেহমন এক মধুর অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন ওর মুখের স্বাদ ফিরে এসেছে। ও খিদে তেষ্টা ফিরে পেয়েছে। কারুর সাহায্য ছাড়া ও এখন উঠে বসতে পারে। আস্তে আস্তে হাঁটতেও পারে। এমনিভাবে যখন কিছুদিন কেটে গেল তখন একদিন আয়েষা হাসতে হাসতে এসে বলল ঃ

'বুদ্ধু, তোমার কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জান ?'

'বাজে বকছ কেন তুটাপী।'

'জান না ? কে বল তো ?' মুখে আয়েষার টিপিটিপি হাসি

১

ভাবীকাল

কুঞ্জুপাতুম্মা আর নিজার আহম্মদের বিয়ের রাত্রি। সেইদিনই বিকেল চারটের সময় একটা খুব মজার ঘটনা ঘটল।

বাপজান তখন মসজিদের ইমামকে নিমন্ত্রণ করতে গেছেন। গ্রামে কয়েকটা বাড়িতে কুঞ্জুপাতুম্মার বিয়ের কথা জানান হলেও কাউকে ভোজের নিমন্ত্রণ করা হয় নি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার বিশেষ কিছুই করা হয় নি। নিজার আহম্মদের আম্মা আর বাপজান বললেন খুব আড়ম্বর হইহই-এর দরকার নেই। পাঁচ দশজন লোকের জন্য ঘি-ভাত করা হয়েছিল। বিয়ের নতুন কাপড় চোপড় ওঁরাই কিনেছিলেন। ওঁরা কি সব কিনেছিলেন কুঞ্জুপাতুম্মা জানতে পারে নি। আয়েষা বলল: স্নান করে ওদের বাড়িতে যেতে। স্নান শেষ হলে আয়েষা ওকে নিয়ে গেল।

আয়েষাদের বাড়ি থেকে তারপর যে বেরিয়ে এল সে আর সেই আগের কুঞ্জুপাতুম্মা নয়। ও তখন সায়া পরেছে, নতুন কাঁচুলি আর ব্লাউজও পরেছে। সবুজ রঙের শাড়ি কুচি দিয়ে পরেছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘোমটা দিয়েছে, পায়ে দিয়েছে চটি। অন্তত এক শো বার ঘরের মধ্যে ওকে এদিক ওদিক হাঁটিয়ে ওর বাড়িতে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

নিজার আহম্মদ বলল—

'ঝুঁকোনা। সোজা হেঁটে বাড়ি চলে যাও।'

এইভাবে পোশাক পরিচ্ছদ পরে কুঞ্জুপাতুম্মা বাড়িতে এল। ওর স্ত দেহ মন কি যেন এক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মুখের সেই ক লা তিলটা জ্বলজ্বল করতে লাগল। ওকে দেখার জন্য রাস্তায় অনেক ছোট ছোট ছেলেপিলে এসে জমা হয়েছিল। আম্মা

খড়মপায়ে উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন। আম্মা দেখলেন যে একটা ছোটখাট গোলমাল শুরু হয়েছে। লোকে সব নানারকম কথাবার্তা বলছে। ভালো করে সব আম্মা শুনতে পেলেন না। আম্মা বাচ্চাগুলকে জিজ্ঞেস করলেন :

'কী রে তোরা সব এখানে গোলমাল করছিস কেন? কী চাই?'

পাজী বাচ্চাগুলো অর্থাৎ আরও সব কুঞ্জুপাতুম্মা, কুঞ্জুতাচুম্মা, আটীমা, মকারের দল বলল :

'কুলু কুলু।'

আম্মা বললেন : 'কী বললি?'

'লুলু লুলু।'

আম্মা ভয়ানক রেগে গেল। বলল :

'মুখ পোড়ারা, তোদের সর্বনাশ হোক—তোদের সাপে কাটুক।'

মেম্মা মেম্মা।'

'বজ্জাত কোথাকার।'

'পেপ্পা পেপ্পা।'

'দাঁড়া লাঠির বাড়ি দিয়ে তোদের মাথা ফাটাব।'

কুঞ্জুপাতুম্মা আসতে আসতে এসব দেখতে পেয়ে দূর থেকেই বলল :

'আম্মা চুপ কর। তুমি কিছু বললেই ওদের আম্মা বাপজানেরা কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে আসবে।'

আম্মা চিৎকার করে সকলকে শুনিয়ে বলল :

'আসুক না দেখি। আসুক না সব হতভাগারা—এসে তোকে একবার দেখুক সব। একবার ওরা আনামকারের সোনা মেয়ের সোনা মেয়েকে দেখে যাক। তোর নানার একটা হাতি ছিল—এই এত্ত-বড় একটা দাঁতালো হাতি।'

'ওঃ হাতি ছিল! হাতি না ছাই! ছিল একটা 'কুড়িআনা'[১]

---

(১) কুড়িআনা—মালয়ালম শব্দে হাতিকে বলে আনা। কুড়িআনা হচ্ছে একরমের ছোট ছোট পোকা—বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে বাস করে। অনেকটা ছারপোকার মত তবে মুখের কাছে দুটো শুঁড় মত আছে। মালয়ালাম ভাষায় কুড়ি মানে গর্ত। সিলেট অঞ্চলে এই পোকাগুলিকে দুন্দুবুড়ী বলে।

তাকে বলছে হাতি।'—নাক দিয়ে শিকনি পড়া কালো একটা একহাত ছেলে পায়ের ঘা চুলকোতে চুলকোতে বলল :

'কুড়িআনা, কুড়িআনা।'

কুঞ্জুপাতুম্মার আম্মার এই বিদ্রূপ সহ্য করা সম্ভব হল না। ধীর পরাক্রমী আনামকারের ওই হাতি, চার চারটে কাফেরকে মেরে ফেলা হাতির মত হাতি, সেই বড় দাঁতালো বিশাল হাতি সে কিনা কুড়িআনা। বাড়ির চারপাশে নোংরার মধ্যে মাটি খুঁড়ে বাস করে যে কুড়িআনা—ছারপোকার মত কালো কালো গন্ধঅলা ছোট ছোট পোকা আনামকারের সেই ভয়ঙ্কর হাতিটার সমান!

'হায় খোদাতালা।' কুঞ্জুপাতুম্মার আম্মা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন :

'এই হারামজাদাদের মাথায় বাজ পড়ুক, এদেব মাথা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাক।'

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার। বাজও পড়ল না। বাচ্চাদের মাথাগুলোও ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ল না!

আম্মা আর একবার করুণস্বরে চিৎকার করে উঠলেন—

'আনামকারের সেই বড় হাতিটা কুড়িআনা, কুড়িআনা!'

কুঞ্জুপাতুম্মার আম্মার মাথা ঘুরতে লাগল। তার নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এক নিমেষের মধ্যে ওর সমস্ত জীবনটার ছবি ওর চোখের মধ্যে ভেসে উঠল। মাথায় হাত দিয়ে ও মাটিতে বসে পড়ল।

কুঞ্জুপাতুম্মা আম্মার কাছে এসে বাচ্চাগুলোকে জিজ্ঞেস করল :

তোরা এত চেঁচামেচি করছিস কেন? কী হয়েছে?'

বাচ্চাগুলো বলল : 'লুলু লুলু।'

'সে আবার কি?'

'পেপ্পা, পেপ্পা।'

'সে আবার কী?'

বাচ্চাগুলো বলল : 'কুড়িআনা, কুড়িআনা।'

‘কী কুড়িআনা ?’ কুঞ্জুপাতুম্মা কিছু বুঝতে পারল না। ভাবল হয়ত কোনও বাচ্চা কুড়িআনা ধরে আম্মার কাপড়ে ছেড়ে দিয়েছে। ও আম্মাকে জিজ্ঞেস করল :

‘আম্মা এরা সব কী বলছে ?’

আম্মা কিছু বললেন না। কি বলবেন। ওর সমস্ত আশা ভরসা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আনামকারের মেয়ে বলে গর্ব করার আর কিছুই নেই। এখন কিসের জন্য বেঁচে থাকা।

কুঞ্জুপাতুম্মা আবার জিজ্ঞেস করল :

‘কি আম্মা কি হয়েছে ?’

শেষে আম্মা কান্না গদগদ স্বরে বললেন :

‘তোর নানার সেই বড় দাঁতালো হাতিটা—সেটাকে বলে কিনা কুড়িআনা, কুড়িআনা।’

আম্মা বুক চাপড়ালেও কুঞ্জুপাতুম্মার মুখে এক বিচিত্র হাসি দেখা দিল।